রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট

রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠানের শেষ চিঠি

রবীন্দ্রনাথ তখন তেইশ, নতুন বউঠান কাদম্বরীদেবী মাত্র পঁচিশ। ১৮৮৪ সালের ১৯শে এপ্রিল আফিম খেলেন নতুন বউঠান, আত্মহত্যার চেষ্টায়। মারা গেলেন ঠিক দুদিন পরে।

কেন আত্মহত্যা করেছিলেন রবির প্রাণের সখা কাদম্বরীদেবী? কেন প্রবলপ্রতাপ বাবামশাই দেবেন্দ্রনাথের আদেশে আত্মহত্যার সব প্রমাণ পুড়িয়ে ফেলা হল? ঘুষ দিয়ে বন্ধ করা হল সকলের মুখ? কাদম্বরীদেবী কি লেখেননি কোনও সুইসাইড-নোট? নাকি লিখেছিলেন? যা পুড়িয়ে ফেলা হয়!...সেই সুইসাইড নোটে কি সত্যিই কিছু অস্বাভাবকিতা ছিল? লুকিয়ে ছিল গোপন গহন ব্যথা?

লেখক বলছেন, 'ঠিক সুইসাইড নোট নয়। এক সুদীর্ঘ চিঠি। চিঠির সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে আগুনে।...ঝলসানো চিঠিটাকে কে বাঁচিয়েছিলেন আগুন থেকে? রবীন্দ্রনাথ?...'

চলুন পাঠক, আমরা ফিরে যাই ১২৭ বছর পূর্বের সেই রহস্যাবৃত সময়ে।...চিঠি নয়, এ এক হতভাগ্য তরুণীর বেদনাবিধুর উপাখ্যান।

কাদম্বরীদেবীর
সুইসাইড-নোট

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট

পত্র ভারতী
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২
দ্বিতীয় মুদ্রণ মে ২০১২
তৃতীয় মুদ্রণ মে ২০১২
চতুর্থ মুদ্রণ জুলাই ২০১২
পঞ্চম মুদ্রণ জুলাই ২০১২

KADAMBARIDEBIR SUICIDE-NOTE
by
Ranjan Bandyopadhyay

ISBN 978-81-8374-149-1

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

টাইটেল ছবি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

মূল্য
১০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 100.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রিয় বন্ধু প্রিয় লেখক

সমরেশ মজুমদারকে

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই

পাঁচটি প্রেমের উপন্যাস

রঞ্জনব্যঞ্জন সেরা ১০১

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড নোট

'ম' প্রিয়তমাসু

প্লাতা নদীর ধারে

লিখিনি যে লিপিখানি

প্রাক্-কথন

মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে আত্মহত্যা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কাদম্বরীদেবী। শোনা যায় আত্মহত্যার কারণ জানিয়ে তিনি একটি সুইসাইড-নোট লিখেছিলেন। সেই চিঠি বা নোট এবং আত্মহত্যার অন্য সব প্রমাণ লুপ্ত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনিবার্য অনুজ্ঞায়। কাদম্বরীর জীবনের শেষ দিনটির কোনও হদিস মেলেনি কারও কাছে। বিষ খাওয়ার পরে মৃত্যুময় আচ্ছন্নতায় তিনি বেঁচে ছিলেন দুদিন। সেই দুদিনও লুপ্ত ছিল অনেকদিন। এখন আমরা জেনেছি সেই দুটি দিনের কথা খুবই আবছাভাবে।

কেন আত্মহত্যা করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কাদম্বরী রবীন্দ্রনাথের বিয়ের চার মাস পরেই? কীভাবে কে বা কারা বন্ধ করে দিলেন তাঁর বেঁচে থাকার পথ? ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে আসার পর থেকে কেমন কাটছিল তাঁর জীবন? ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহল কেন তাঁকে গ্রহণ করল না? কাদের প্ররোচনার শিকার হলেন তিনি? রবীন্দ্রনাথ কি পারতেন তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বাঁচাতে? না কি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদম্বরীর সম্পর্কই তৈরি করল কাদম্বরীর অন্তিম অসহায়তা? আত্মহনন ছাড়া আর কোনও উপায় রইল না তাঁর?

এই উপন্যাসটি লেখা পর্যন্ত একটি প্রশ্নে আমি জড়িত ছিলাম অহরহ—কী লিখেছিলেন কাদম্বরীদেবী তাঁর সুইসাইড-নোটে? কী লিখতে পারতেন তিনি? কার উদ্দেশে লিখতেন তিনি তাঁর সুইসাইড-নোট?

আমি ধরে নিলাম কাদম্বরীদেবীর সেই সুইসাইড-নোটটি হঠাৎ পাওয়া গেল তাঁর আত্মহননের একশো সাতাশ বছর পরে। সেটিকে আগুনে ছাই হতে দেননি রবীন্দ্রনাথ। ধরে নিলাম সেই ঝলসানো সুইসাইড-নোটের পাঠোদ্ধার সম্ভব হল শেষপর্যন্ত!

সংবাদ প্রতিদিন-এর সম্পাদক সৃঞ্জয় বোস (টুম্পাই)-কে যখন জিগ্যেস করলাম এবছর যদি আমার পুজোর উপন্যাসের বিষয় হয় কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট, ও মহা-উৎসাহে আমাকে বলল, অবশ্যই! সংবাদ প্রতিদিন-এর পুজো-সংখ্যার সম্পাদক রবিশংকর বল প্রথম থেকে জুগিয়েছে উৎসাহন ও প্রেরণা—আমি কৃতজ্ঞ।

পত্র ভারতী-র কর্ণধার, পরম সুহৃদ ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় যেই শুনল আমার উপন্যাসের বিষয়, গত বছরের মতন এ-বছরেও বলল, রঞ্জনদা, এ-উপন্যাস আর কাউকে নয়, অবশ্যই পত্র ভারতী-কে। বিষয়টি ও তার বিন্যাস নিয়ে ত্রিদিবের সঙ্গে একাধিকবার আলোচনা করেছি এবং প্রতিবারেই ঋদ্ধ হয়েছে আমার ভাবনা, উপকৃত হয়েছে এই উপন্যাস। আমি কৃতজ্ঞ।

সৃঞ্জয় বোসের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা আরও এক জায়গায়। ত্রিদিব তো বলল উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য পত্র ভারতীকেই দিতে—কিন্তু উপন্যাসটি যেহেতু বেরিয়েছিল সংবাদ প্রতিদিন-এর শারদ সংখ্যায়, সৃঞ্জয়ের অনুমতি ছাড়া তো ত্রিদিবকে 'হ্যাঁ' বলতে পারলাম না। সৃঞ্জয়ের অনুমতি পেতে লেগেছিল তিন সেকেন্ড, কে প্রকাশক জানাবার পর।

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট বই হয়ে বেরোল কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের পর।

১৫ জানুয়ারি ২০১২
কলকাতা

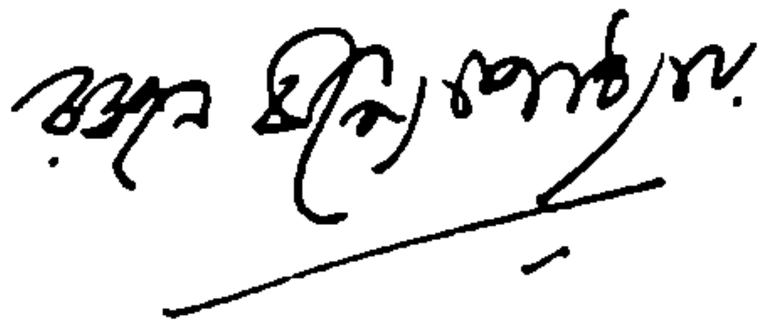

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট

১৮৮৪-র ১৯ এপ্রিল। আত্মহত্যার চেষ্টায় আফিম খেলেন কাদম্বরীদেবী—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী, রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান। মারা গেলেন দু'দিন পরে, ২১ এপ্রিল।

এই দুদিন মৃত্যুর সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করেছিলেন কাদম্বরীদেবী? তাঁর শেষ চিকিৎসার জন্যে প্রথম দিনেই এসেছিলেন সাহেব ডাক্তার ডি. বি. স্মিথ। ৪০০ টাকা খরচ করে আনা হয়েছিল তাঁকে, চেকে টাকা দেওয়া হল। এরপর ওষুধ এল ২৫ টাকার। বাড়িতে তো আর সাহেব ডাক্তারকে রাখা যায় না। কিন্তু কাদম্বরীদেবীর অবস্থা ক্রমশই খারাপ হচ্ছে। তাঁর শ্বাসকষ্ট বাড়ছে। আরও গভীর হচ্ছে তাঁর আচ্ছন্নতা। বিশেষ ভয় রাত্রের দিকে। তখন হাতের কাছে ডাক্তার পাওয়া সহজ নয়। তাই সাহেব ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা চললেও রাত্রে বাড়িতে রাখা হল একজোড়া বাঙালি ডাক্তার—নীলমাধব হালদার, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তেতলার ঘরে রাখা হয়েছে কাদম্বরীদেবীকে। এ-ঘরে কেউ থাকেন না। সুতরাং

ঘরে আলো নেই। সেই ঘরের জন্যে দেড়টাকা খরচ করে বাতি এল। বাতির আলোয় নিঃসাড় পড়ে আছে কাদম্বরী, তাঁর শরীর থেকে প্রাণের আলো ক্রমে চলে যাচ্ছে। অবস্থা খারাপ হতে এলেন আরও একজন দামি ডাক্তার—ভগবৎচন্দ্র রুদ্র। ইনিও থাকলেন রাত্রিবেলা। এতগুলি ডাক্তারের জন্যে দুবেলার মহাভোজ আসতে লাগল উইলসন হোটেল থেকে। কিন্তু এঁদের সমবেত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ২১ এপ্রিল সোমবার সকালে মারা গেলেন কাদম্বরী দেবী। জ্যোতিরিন্দ্র-রবীন্দ্রের প্রবল পিতৃদেব গৃহকর্তা, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কঠোর আদেশে লোপাট করা হল আত্মহত্যার সকল প্রমাণ। ঘুষ দিয়ে বন্ধ করা হল সংবাদপত্রের মুখ। কোনও সংবাদপত্রে ছাপা হল না কাদম্বরীদেবীর মৃত্যুসংবাদ। তাঁর দেহ মর্গে পাঠানো হল না, পাছে সেখান থেকে বেরিয়ে যায় তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবর। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে দেবেন্দ্রনাথেরই হুকুমে গোপনে বসেছিল করোনার কোর্ট। ওই পরাক্রমী পুরুষটির নেপথ্য প্ররোচনায় 'হারিয়ে' গেল করোনার রিপোর্ট।

কাদম্বরীদেবীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অবিশ্যি 'কাঠ খাট ঘৃত চন্দন ধূনা' প্রভৃতি সহযোগে হয়েছিল নিমতলা শ্মশানে পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের তত্ত্বাবধানে। সেখানে

উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। অনুপস্থিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ।

কাদম্বরীর আত্মহত্যার পরেই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী মেজবউঠাকরুণ জ্ঞানদানন্দিনীদেবী আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বেড়াতে গেলেন জাহাজে করে। তাঁরা রবীন্দ্রনাথকেও সঙ্গে নেন।

কেন আত্মহত্যা করলেন কাদম্বরীদেবী? কী তাঁরে দহিত? সেকথা কি তিনি জানিয়েছিলেন তাঁর সুইসাইড নোটে? সেই সুইসাইড নোট লুপ্ত ছিল একশো সাতাশ বছর। সেটি পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি!

ঠিক সুইসাইড 'নোট' নয়। এক সুদীর্ঘ চিঠি। চিঠিটার সর্বাঙ্গ ঝলসে গেছে আগুনে। সব চিঠিটা ঠিক পড়াও যায় না।

ঝলসানো চিঠিটিকে কে বাঁচিয়েছিলেন আগুন থেকে?

রবীন্দ্রনাথ?

পিতৃ-আদেশ অমান্য করে?

অনেক কষ্টে সেই ঝলসানো চিঠির করুণ অক্ষরগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হল শেষপর্যন্ত।

কাদম্বরীদেবীর সুইসাইড-নোট

প্রাণের রবি,

এই সবে শুরু হয়েছে আমার জীবনের শেষ দিন। পুবের আকাশ সবে লাল হচ্ছে। আজকাল তোমার ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরি হয়। সেটাই তো স্বাভাবিক। মাত্র চারমাস বিয়ে হয়েছে তোমার।

আগে তো সূর্য ওঠার আগে তুমি উঠতে। আমার ঘুম ভাঙাতো তোমার সকালবেলার গান। আমরা একসঙ্গে যেতাম নন্দনকাননে। আমার ঘরের পাশে ছাদের উপর যে-বাগানটি একসঙ্গে করেছিলাম আমরা, তুমি তার নাম দিলে নন্দনকানন, তারপর একদিন সেই বাগানে ভোরের প্রথম আলোয় আমাকে চুমু খেয়ে জিগ্যেস করলে—'নতুন বউঠান, নামটা তোমার পছন্দ হয়েছে?' আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁটা দিচ্ছে। আবার ভয়ে বুক করছে দুরদুর।

ঠাকুরপো, 'এমন দুঃসাহস ভালো নয়, কেউ দেখে ফেললে কী হবে জানো?' বললাম আমি।

তোমার বয়েস তখন উনিশ। সবে ফিরেছ বিলেত থেকে। আমি একুশ।

তুমি হেসে উত্তর দিয়েছিলে, 'এ তো নন্দনকানন। মর্ত্যলোকের দৃষ্টি এখানে এসে পৌঁছয় না নতুন বউঠান।'

আমি বললাম, 'তোমার সঙ্গে কথায় পারব না রবি। কিন্তু তোমার-আমার সম্পর্ক তো শুধুই আমাদের, তাকে প্রকাশ কোরো না তুমি। আমার ভয় করে।'

'কীসের ভয়?'

'তোমাকে হারানোর ভয়। এ-বাড়িতে তুমি ছাড়া আমার আর কোনও বন্ধু নেই। একমাত্র বন্ধু তুমি। কেউ কারও মন বোঝে না এ-বাড়িতে। শুধু তুমি বোঝো আমার মন।'

'তুমি ভাব আমি বুঝি তোমার মন। কিন্তু কেউ কারও মন কি সত্যি বোঝে নতুন বউঠান? কিছুটা হয়তো অনুভব করি। কিন্তু তোমার সমস্ত মন—অসম্ভব, অসম্ভব।'

ঠাকুরপো, তোমার এরকম কথায় আমার খুব কষ্ট হয়। এসব তোমার সাজানো কথা। আমার সমস্ত মনটাই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি ঠাকুরপো। কারও জন্যে কিচ্ছু রাখিনি। সেই মনের সবটুকু তুমি বোঝো না! তুমি যখন আমার চোখের দিকে তাকাও, আমি বুঝতে পারি, তুমি অনুভব করছ আমার হৃদয়ব্যথা। তুমি জানো কোথায় আমার কষ্ট, আমার দহন।

তুমি কি সত্যি বোঝো না ঠাকুরপো বুকের মধ্যে তোমার জন্যে যে-মনকেমন, যে-কষ্ট আমি দিনরাত চেপে রাখি? আমি জানি ঠাকুরপো, তুমি বোঝো। অন্তত একদিন

বুঝতে...ক'মাস আগে পর্যন্তও...

তুমি যে আমার ছেলেবেলার খেলার সাথি।

রবি, তোমাকে চিরদিনের জন্যে ছেড়ে যাওয়ার আগে মনের কথাটি জানিয়ে যাই। কোনও মিথ্যে নেই এ-কথার মধ্যে। আমি বানানো কথা বলতে শিখিনি।

তোমাকে, শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি।

তোমার মতো আর কোনও পুরুষ যে আমি দেখিনি ঠাকুরপো। রূপে গুণে, গান আর প্রাণের প্লাবনে তুমি যে অনন্য।

তোমার এই পঁচিশ বছরের বউঠাকরুণটি তোমাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাওয়ার আগে তোমাকে বলে যাচ্ছে—তুমিই তার একমাত্র অবলম্বন ছিলে এ-সংসারে। একমাত্র ভালোবাসার পুরুষ।

ঠাকুরপো, সেদিন ছিল জ্যোৎস্নারাত। জোড়াসাঁকোর বাড়ির ছাদে শুধু তুমি আর আমি। তুমি গাইছিলে গান। আমার সেদিন মন ভালো ছিল না। তোমাকে বলিনি সেকথা। তবু তুমি বুঝতে পারলে আমার মনের কষ্ট। তুমি যে আমার দোসর ঠাকুরপো। আমার কানের কাছে মুখ এনে গাঢ় স্বরে বললে, 'নতুন বউঠান, কী হবে ছোটখাটো দুঃখের কথা মনে রেখে? ভুলে যাও, সব ভুলে যাও।'

'ভুলতে বললেই কি ভুলতে পারা যায়? কতদিনের কত

অপমান, কত কষ্ট, সেই ন'বছর বয়সে তোমাদের বাড়ি বউ হয়ে এসে পর্যন্ত সহ্য করছি—' বলেছিলাম আমি।

তুমি আমার হাতের উপর হাতটি রেখে শুনশান বিশাল ছাদটির এক কোণে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে। তারপর বললে, 'নতুন বউঠান, জ্যোতিদাদা এখনও আসেনি বুঝি?'

'আজকাল তোমার জ্যোতিদাদার বাড়ি আসার কোনও সময় নেই। কখন আসেন কখন যান, আমার সঙ্গে দেখা হয় কতটুকু। কাল রাত্রে তো...'

'জানি, মেজবউঠাকরুণের ওখানে গানবাজনার আসর বসেছিল। আমিও ছিলাম কিছুক্ষণ। জ্যোতিদাদাই তো সেই আসরের প্রাণপুরুষ। জ্যোতিদাদা যে সেই মজলিশ ছেড়ে আসতে পারবে না, সেটা বুঝতে পেরেছিলুম।'

'জ্যোতিদাদার দিনরাত আজকাল মেজবউঠাকরুণের কাছেই কাটে।'

কথাটা তোমাকে বলতে খুব কষ্ট হয়েছিল আমার ঠাকুরপো। তুমি কোনও উত্তর দিলে না।

আমি বললাম, 'শুধু তোমার জন্যে বেঁচে আছি ঠাকুরপো। আমার বেঁচে থাকার আর কোনও কারণ নেই।'

ঠাকুরপো, একথা শুনে তুমি আমার দিকে তাকালে। তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় করল।

আমার মনে পড়ছে, চাঁদের আলোয় তোমার সেই রূপ।

যেন এক তরুণ দেবদূত। কিন্তু তোমার চোখের দৃষ্টি আমাকে শান্তি দিল না। মনে হল, আমার শেষ আশ্রয়টুকুও চলে যাবে। ঠাকুরপো, সেই রাত্রে চাঁদের আলোর মধ্যে তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আরও একবার নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলাম, তুমি আমার জীবন থেকে চলে গেলে আমি বাঁচব না, বাঁচতে পারব না।

তুমি আমাকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরলে। কিন্তু সেই আলিঙ্গনের মধ্যে কোনও আশ্রয় পেলাম না—যে-আশ্রয় আমি চেয়েছিলাম। আমি কেঁদে তোমার বুক ভাসিয়ে ছিলাম। চাঁদের আলো মিশে গেল আমার কান্নায়।

তোমার দিকে মুখ তুলে দেখি তোমার চোখেও জল—সেই প্রথম তোমার চোখে জল দেখলাম ঠাকুরপো। চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে তোমার চাপা কান্না।

আমি বললাম, 'ঠাকুরপো, তোমার জন্যে আমার মন এতদিন ধরে যে-মালা গেঁথে রেখেছে, আজ এই চাঁদকে সাক্ষী করে সেই মালা তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম। তুমি তোমার জীবনে আমাকে বরণ করে নাও।'

তোমার চোখের জল নিঃশব্দে ঝরে পড়ল আমার কপালে, আমার গালে, আমার বুকের ওপর।

প্রাণের ঠাকুরপো, জীবনের এই শেষ দিনে, তোমাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে, অনেক কথা মনে পড়ছে। কত

কথা, স্মৃতি, হতাশা, অপমানের বেদনা, একাকিত্বের কষ্ট— সব জমে আছে বুকের মধ্যে। অনেক কথা তুমিও জানো না।

কিন্তু মৃত্যু যতই কাছে এগিয়ে আসছে, বিদায়ের ঘণ্টা যতই শুনতে পাচ্ছি, ততই যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে মন, ভাবনারা সব ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাদের ওপর আমার শাসন ক্রমশই আলগা হয়ে যাচ্ছে। মনের এই অবস্থায় গুছিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় ঠাকুরপো। কিন্তু তবু লিখতে আমাকে হবেই। না লিখেও আমার মুক্তি নেই গো।

কোথা থেকে শুরু করব বলো তো? ১৮৫৯-এ ৫ জুলাই আমার জন্ম থেকে? ঠাকুরপো, কেন তোমাদের মতো অভিজাত ধনী পরিবারে জন্ম হল না আমার? তাহলে তো এত অপমান সহ্য করতে হত না।

ঠাকুরপো, আমার অপমানের গল্প কিন্তু শুরু হয়েছিল আমার জন্মের আগে থেকেই। সেকথা হয়তো তুমিও জানো, কিন্তু কোনওদিন কোনওভাবে বুঝতে দাওনি, পাছে আমি কষ্ট পাই। একদিন শোওয়ার ঘরে দুপুরবেলা একাই শুয়েছিলাম আমি। শুধু মনে আসছিল পুরোনো কষ্টের কথা। কান্না কিছুতেই রাখতে পারছিলাম না। হঠাৎ এলে তুমি। হাতে তোমার কবিতার খাতা। নিশ্চয় নতুন কোনও কবিতা বা গান লিখেছ। শোনাতে চাও আমাকে। আমিই তো সব সময়ে

ছিলাম তোমার প্রথম শ্রোতা, এই সেদিন পর্যন্ত। তুমি আমার চোখে জল দেখে থমকে দাঁড়ালে। খাতাটি খাটের পাশে টেবিলটার ওপর রেখে বসলে আমার পাশে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলে আমার চোখের দিকে। আমি আলতো করে হাত রাখলাম তোমার বুকের ওপর। মনে হল, ভেতরটা আমার জুড়িয়ে গেল।

তুমি আমার কপালে হাত রেখে বললে, 'নতুন বউঠান, পুরোনো চিঠির মতো পুরোনো কষ্টও ধুলায় হোক ধূলি।' সেই মুহূর্তটি আজ জীবনের শেষ দিনে মনে পড়ছে বারবার। ঠাকুরপো, আর কেনওদিনই কি ফিরে আসবে না আমার প্রতি তোমার প্রেম, তোমার মনের আদর, ফিরে আসবে না তোমার সঙ্গে নন্দনকাননে সেই সব অমল সকাল, শোওয়ার ঘরে সেইসব নিঝুম দুপুর, দক্ষিণের বারান্দায় সেইসব বর্ণিল বিকেল, ছাদের ওপর স্নিগ্ধ সন্ধে থেকে মগ্ন রাত? ফিরে আসবে না তোমার আমার এক সঙ্গে কবিতা পাঠ, গান গাওয়া? তুমি আরও একবার আমার হবে না আমার সব হারানোর মধ্যে? যা ভাঙল তা ভেঙেই গেল?

ঠাকুরপো, কথায়-কথায় খেই হারিয়ে কোথায় চলে এলাম! তোমাকে তো বলেইছি, মনটা বড্ড এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

কিছুতেই নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারছি না। বলতে যাচ্ছিলাম আমার জন্মের আগের কথা। সেকথা বলতে গিয়ে কোথায় চলে এলাম। ঠাকুরবাড়িতে, বিশেষ করে এ-বাড়ির মেয়েমহলে, আমার সে অপমান, তার সূত্র ধরে চলে যাওয়া যায় আমার জন্মের আগের ঘটনায়—আমার ভাগ্য সেইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

প্রাণের রবি, ঠাকুরবাড়ির বউ হওয়ার আগে তোমাদের কাছে—না না তোমার কাছে নয়, তুমি তো আমার ভালোবাসার মানুষ—আর সকলের কাছে—বিশেষ করে তোমার আইসিএস সেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর আর তাঁর বিলেতফেরত স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীর কাছে আমার পরিচয় ছিল, আমি তোমাদের বাজারসরকার শ্যাম গাঙ্গুলির তিন নম্বর মেয়ে। সেটাই অবিশ্যি আমার সম্পর্কে শেষ কথা নয়। আরও একটু আছে—এমন এক পরিবারে জন্ম আমার যে-পরিবারের থাকা-খাওয়া জোটে তোমাদের, অর্থাৎ ঠাকুরবাড়ির দাক্ষিণ্যে।

আমার ঠাকুরদা জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় এক গুণী সঙ্গীতশিল্পী। সে কথা তুমি তো জানো ঠাকুরপো। কতবার তুমি আমাকে বলেছ, আমি আমার গানের গলা পেয়েছি আমার ঠাকুরদার কাছ থেকে। কিন্তু তাঁর গুণের কোনও স্বীকৃতি ছিল না অভিজাত, ধনী ঠাকুরবাড়িতে—তিনি যে গরিব, তোমাদের দাক্ষিণ্যে বেঁচে আছেন।

তোমরাই তাঁকে মাথা গোঁজার জন্যে একটা বাড়ি দিয়েছিলে—কলকাতার খারাপ পাড়া হাড়কাটা গলিতে। আমি হয়তো সেই হাড়কাটা গলির মেয়ে। তাই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহিলামহল আমাকে সারাজীবন এত হেয় করল, কষ্ট দিল।

হাড়কাটা গলির ওই বাড়িটা আমার ঠাকুরদা পেয়েছিলেন দান হিসেবে। কিন্তু সে ছিল করুণার দান। সেই দান গ্রহণ করার মধ্যে কোনও সম্মান ছিল না।

ঠাকুরপো, আমি জানি না ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে আমার বাড়ির সম্পর্ক তুমি কতটা জানো। জানলেও, আমাকে জানতে দাওনি যে তুমি জানো। এক অর্থে আমিও কিন্তু ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। কিন্তু সেকথা ভাববার অধিকার আমাকে কেউ কোনওদিন দেননি। আমি ঘাটেরও নই, পারেরও নই। এইভাবে কেটে গেল আমার জীবনের পঁচিশটা বছর।

আমার পরিবারের গল্প, আমার জন্মের কাহিনি আজ তোমাকে কিছুটা বলে যাই। তা হলে হয়তো কিছুটা বুঝবে, কী আমাকে দহন করেছে এত বছর ধরে। আমার মৃত্যু কী জুড়াবে!

আমার ঠাকুরদা জগন্মোহনের সঙ্গে বিয়ে হয় তোমার ঠাকুরদা দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণির। এসব কথা তোমাকে দু-একদিন বলবার চেষ্টা করেছিলাম। তুমি বলতে,

থাক না সেই সব দূরের কথা, কিছুতেই বলতে দিতে না তুমি, পাছে এসব কথা বলতে গিয়ে আমি ভিতরে-ভিতরে কষ্ট পাই।

একদিন বললে—আমার বেশ মনে আছে, দুপুরবেলা আমার শোবার ঘরের খাটে আমার পাশেই শুয়েছিলে তুমি—চুপচাপ ছিলে অনেকক্ষণ, জানলা দিয়ে দেখছিলে আকাশে মেঘের ঘনঘটা—আমি সেই সুযোগে তোমাকে শোনাতে চাইলাম আমার পরিবারের পূর্বকথা—তুমি বললে, 'নতুন বউঠান, কী হবে পুরোনো দুঃখ-কষ্টের কথা ভেবে—ভুবন জুড়ে এত আনন্দ, সেই আনন্দধারাকে অন্তরে গ্রহণ করো, দেখবে ঝরা পাতার মতো পুরোনো দুঃখ সেই আনন্দস্রোতে ভেসে গিয়েছে।'

আমি তোমার হাতটি এনে রাখলাম আমার বুকের ওপর। বললাম, 'শত দুঃখের মধ্যেও সেই আনন্দকে আমি ধরে আছি এই মুহূর্তে আমার বুকের মাঝখানটিতে।'

ঠাকুরপো, আমার মনে হল যেন চিরকাল তোমার হাতটিকে আমার বুকের মাঝখানটিতে এইভাবে ধরে রাখতে পারি—তুমি আর কারও নও ঠাকুরপো, শুধুই আমার।

আজ পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে বুকের মাঝখানটা বড্ড খালি হয়ে গেছে। কিছু নেই সেখানে। শুধু শূন্য।

কোথায় তোমার হাত? কোথায় তোমার সেই সুধাময় স্পর্শ ঠাকুরপো? সব হারিয়ে গেল? সব তুমি কেড়ে নিলে?

তুমি হঠাৎ বললে, 'চলোতো নাটকের মহড়াটা আরও একবার শুরু করা যাক। তোমার মন এখুনি ভালো হয়ে যাবে বউঠান।' তখন তোমার জ্যোতিদার লেখা 'অলীকবাবু' নাটকের মহড়া চলছে রোজ বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত। সেই নাটকের নায়ক-নায়িকা তুমি আর আমি। নায়ক অলীকবাবু তুমি, নায়িকা হেমাঙ্গিনী আমি। যার পর থেকে তুমি আমাকে চুপিচুপি 'হে' বলে ডাকতে শুরু করলে।

আমি তোমার হাতখানি বুকের মাঝে ধরে সেই দুপুরবেলা আমার খাটে শুয়ে-শুয়ে শুরু করলাম নাটকের মহড়া ঃ

'আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করিয়া, মুক্তকণ্ঠে বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী, শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, আমিই তোমার স্ত্রী।'

তুমি চুপ করে শুনলে, কোনও কথা বললে না অনেকক্ষণ। তোমার হাতটিকে আমার বুকের ওপর থেকে সরিয়েও নিলে না। পাশ ফিরে শুধু তাকালে আমার মুখের দিকে।

ঠাকুরপো, আজও ভুলতে পারিনি তোমার সেই আর্তিময় আঁখিপাতের মায়া।

*

আবার এলোমেলো চলতে-চলতে যে-কথা বলতে যাচ্ছিলাম, তার থেকে কতদূরে চলে এলাম! এই রকমই ঘটতে থাকবে ঠাকুরপো। মৃত্যুর এত কাছে দাঁড়িয়ে কখনও তো কিছু লিখিনি—যেই সে-কথা ভাবছি অবশ হয়ে আসছে দেহ-মন। মনের মধ্যে সব কিছু অগোছালো, শিথিল হয়ে যাচ্ছে। তোমাকে যে এ-চিঠি পড়তেই হবে, তাও নয়। চিঠিটা আমার সঙ্গে চিতায় জ্বালিয়ে দিও।

ঠাকুরপো, আমার একটি দুঃখের জায়গা—আমার চোখের সামনে আমার বাবার অপমান—দিনের পর দিন। আমি ঢুকলাম তোমাদের বাড়ির অন্দরমহলে—কিন্তু বাবা থেকে গেলেন বারমহলে, সামান্য বেতনের শ্যাম গাঙ্গুলি হয়ে। যদিও তিনি ঠাকুরবাড়ির বেয়াই, কোনও সম্মান পাননি কোনওদিন। সেই উদারতা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে ছিল না ঠাকুরপো। ছিল শুধু তোমার মধ্যে—কিন্তু তুমি তো আলাদা, সবার থেকে অন্যরকম।

আমার বাবা যে সারা জীবন ঠাকুরবাড়ির অসম্মানের মধ্যেই থাকতে বাধ্য হলেন, তার কারণ, তোমাদের দাক্ষিণ্যেই আমাদের পরিবার চিরকাল খেতে পরতে পেয়েছে। তোমাদের দাক্ষিণ্যেই তো আমি ঠাকুরবাড়ির বউ হতে পেরেছিলাম।

কিন্তু তবু ডালে-ডালে-পাতায়-পাতায় আমিও তো দ্বারকানাথের পরিবারের সঙ্গে জড়িত। তোমার ঠাকুরদা দ্বারকানাথের পরিবারের সঙ্গে জড়িত। তোমার ঠাকুরদা দ্বারকানাথের মামাতো বোন শিরোমণিকেই তো বিয়ে করেন আমার ঠাকুরদা জগন্মোহন। দ্বারকানাথের মামা অথাৎ শিরোমণির বাবার নাম ছিল কেনারাম রায়চৌধুরী। আমার অসম্মানটা কোথায় জানো ঠাকুরপো? হাড়কাটা গলির বাড়িটা কিন্তু শিরোমণি তাঁর বাবার কাছ থেকে পাননি। পেয়েছিলেন কাকিমা রামপ্রিয়ার কাছ থেকে।

কে এই রামপ্রিয়া? তুমি হয়তো জানো না, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, রামপ্রিয়া ছিলেন দ্বারকানাথের ঠাকুরদা নীলমণি ঠাকুরের ভাই গোবিন্দরামের স্ত্রী। রামপ্রিয়া কেন কুখ্যাত বণিতাপাড়া হাড়কাটা গলিতে একখানি বাড়ি দিতে গেলেন শিরোমণিকে? বারে, আমার ঠাকুরদা জগন্মোহন, যাকে তোমাদের বাড়ির সবাই জগমোহন বলে ডাকেন, তিনি তো গরিব মানুষ—বিয়ের পরে বউকে নিয়ে থাকবেন কোথায়? তাই খারাপপাড়ার একখানা গেরস্তবাড়ি দেওয়া হল তাঁর বউকে—দিলেন বউয়ের কাকিমা রামপ্রিয়া। আমার ঠাকুরদা আর ঠাকুমা ওই হাড়কাটা গলিতেই থাকতেন। এমন একটা মানুষকে ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্য কী চোখে দেখবে তা তো তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না ঠাকুরপো।

আমার বাবা শ্যাম গাঙ্গুলির কাজ জুটল তোমাদের বাড়িতেই। বাজারসরকারে কাজ। আর নানারকম ফরমাশ খাটার কাজ। আমার বিয়ের পরেও সেকাজ তাঁকে করতে হয়েছে—বারবাড়ির ফরমাশই তিনি বেশি খাটতেন। অন্দরমহলে তাঁকে কদাচিৎ দেখতে পেতাম। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী আমি—অথচ জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ তাঁর জামাই, তিনি এবাড়ির বেয়াই, এসব কথা তাঁর পক্ষে স্বপ্নেও ভাবা সম্ভব হয়নি।

হঠাৎ ঠাকুরবাড়ির আভিজাত্যের টনক নড়ল। কেউ-কেউ ভাবতে শুরু করলেন, শ্যাম গাঙ্গুলিকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে না রাখাই ভালো—দূরে কোথাও পাঠিয়ে দিলে সামাজিক লজ্জা থেকে দু-পক্ষেরই মুক্তি। সামান্য বেতনে আমার বাবাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল তোমাদের গাজিপুরের বাড়িতে। সেখানে তোমাদের বিশাল জমিদারি। অনেক বড় বাড়ি। দায়িত্বও অনেক। আমার বাবা আমার চোখের সামনে থেকে সরে গেলেন। আমি বাঁচলাম। এও তো ঠাকুরবাড়িরই দান। আমি কৃতজ্ঞ।

ঠাকুরপো, সবে তখন বিয়ে হয়েছে আমার। ন'বছরের বালিকা আমি। একদিন মেজবউঠাকরুণের ঘরের পাশে যেতেই শুনতে পেলাম মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কণ্ঠস্বর। তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলছেন—

'এ কাকে নিয়ে এলে বাড়িতে? ওই মেয়েটা জ্যোতির যোগ্য পাত্রী! কোনদিক থেকে সে জ্যোতির মতো ছেলের উপযুক্ত? এটা একটা বিয়ে হল?'

ঠাকুরপো, আমার খুব ভয় করল কথাটা শুনে। আর খুব দুঃখও হল। ভয় করল, যদি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয় সবাই মিলে? আমি কোথায় যাব?

মেজবউঠাকরুণ বললেন, 'ওকে আমরা মেজেঘষে তৈরি করে নেব। তাছাড়া, জ্যোতি ঠাকুরপোরও কিছুটা দায়িত্ব আছে ওকে নিজের মনের মতো করে গড়ে তোলার।'

মেজবউঠাকরুণের কথায় যেন আগুনে ঘি পড়ল। জ্বলে উঠলেন সত্যেন্দ্রনাথ। বললেন, 'ও মেয়ে কোনওদিন ভালো মেয়ে হবে না, তোমরা দেখে নিও। বাজার সরকার শ্যামের মেয়ে হয়ে উঠবে জ্যোতির যোগ্য স্ত্রী? তোমরা মেজেঘষে কাকে তৈরি করবে? জ্যোতির এ বিয়েতে আপত্তি করা উচিত ছিল।'

আমার হাত-পা সব কাঁপতে লাগল। খুব কান্না এল বুকের মধ্যে। কিন্তু চোখ শুকনো। মেজবউঠাকরুণকে বলতে শুনলাম, 'বাবামশায়ের ইচ্ছে এ-বিয়ে হোক। জ্যোতি ঠাকুরপো বাবামশায়ের বিরুদ্ধে কথা বলবে, এ-কথা তুমি ভাবতে পারলে!'

'এটা বাবামশায়ের জেদ। অন্যায় জেদ। জ্যোতি মেনে

নিল বটে, কোনও প্রতিবাদ পর্যন্ত করল না—এ বিয়েতে কারও মঙ্গল হবে না।'

ঠাকুরপো, ওই কথাটা আজও আমার কানে লেগে আছে—'এ বিয়েতে কারও মঙ্গল হবে না।' তোমাদের সংসারে সবথেকে বড় অমঙ্গল আমি। তোমাকে ভালোবেসে আমি অসতীও। আজ সেই অমঙ্গলের, অসতীর বিদায়। আমি চাই তোমাদের সংসারে সুখ-শান্তি ফিরে আসুক। তোমার নতুন দাদা আমাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে মনে হয় না একদিনের জন্যেও সুখী হয়েছিলেন। মনেরই তো মিল হল না আমাদের। সত্যিই আমি ওঁর যোগ্য স্ত্রী হতে পারলাম না। উনি সারাজীবন থেকে গেলেন অনেক দূরের মানুষ। ঠাকুরপো, তুমি আমাকে এত ভালোবাসলে। ভালোবাসলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। আমার প্রতি বিহারীলালের ভক্তি, অনুরাগ—সত্যিই আমাকে লজ্জা দিত। কিন্তু তোমার নতুনদাদার প্রেম—না, পেলাম না কোনওদিন। কোনওদিন তাঁর কাছের মানুষ হয়ে ওঠার সম্মানটুকুও পাইনি। ঠাকুরপো, তোমার কাছে লুকোবার কিছু নেই। তুমি অন্তত অনুভব করতে পেরেছ, আমার সঙ্গে তোমার নতুনদাদার সম্পর্কটা বড় বেশি সাজানো। আমাদের সম্পর্কে কোনও প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়নি ঠাকুরপো। সম্পর্কের ভেতরটা একেবারে শীতল। ঠাকুরপো, আমার মনে আছে, একদিন ঘোর বৃষ্টির মধ্যে তুমি

আমি দু'জনেই ভিজছি আমাদের বড় সখের নন্দনকাননে। এদিকটা শুধুই আমাদের। এদিকে কেউ বড় একটা আসতেন না। বৃষ্টির মধ্যে মালতীলতার আড়ালে তুমি হঠাৎ আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। সেই টানের মধ্যে তোমার অন্তরের উজান ছিল ঠাকুরপো। আমি বাধা দিতে পারিনি। চাইওনি। কোনও-কোনও অন্যায়ের গলায় দুলে ওঠে হৃদয়ের বরমাল্য। সেই অন্যায়কে বরণ করে নেয় সমস্ত মন প্রাণ। ঠাকুরপো, তোমার আলিঙ্গন ছিল তেমন অন্যায়।

বৃষ্টিতে ভিজছ তুমি। কী সুন্দর দীর্ঘ শরীর তোমার। তোমার দীর্ঘ সিক্ত কেশদাম নেমে এসেছে বলিষ্ঠ গ্রীবা পর্যন্ত। তোমার আয়ত দুটি চোখে মেঘলা আকাশের মায়া। তুমি আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলে ঃ

'ঠাকুরবাড়িতে একটি উপবাসে আমরা সবাই কষ্ট পেয়েছি। চিরকাল, আদরের উপবাস।'

'আদরের উপবাস'—মাত্র দুটি শব্দ, অথচ আমার সমস্ত শরীরের মধ্যে বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিশে বয়ে গেল ওই শব্দ দুটি—তোমার কণ্ঠস্বর স্পর্শ করল আমার সমস্ত শরীর। আমি স্থানকাল ভুলে গেলাম। মনে হল প্রবল বৃষ্টির মধ্যে তোমার শরীর গলে যাচ্ছে আমার শরীরের মধ্যে। মনে হল আমার শরীর মিশে যাচ্ছে তোমার শরীরে। কোনও তফাত নেই আর।

তোমার দিকে মুখ তুলে বললাম, 'আমাকে একটু আদর করবে ঠাকুরপো? কতদিন—কতদিন কোনও আদর পাইনি আমি।'

তুমি যেন জলদেবতা। সামান্য নীচু হলে তুমি। আমার মুখখানি তুলে নিলে কত আদরে—চুমু খেলে আমার ঠোঁটে। এক ঝলকের আলতো চুমু। মনে হল, এই প্রথম আদর পেলাম আমি। হতে পারে অন্যায়। তবু মনে হল, জীবনে এরচেয়ে বেশি কিছু, বড় কিছু, পবিত্র কিছু আমি পাইনি। যেন এতকাল বেঁচে ছিলাম এই মুহূর্তটির জন্যেই। আমার ঠোঁটে তোমার সেই প্রথম চুমু আজও ফুরিয়ে যায়নি ঠাকুরপো। আমার জীবন ফুরিয়ে যেতে চলল।

আবার খেই হারিয়ে ফেলেছি। তোমার মতো গুছিয়ে যদি লিখতে পারতাম। অথচ না লিখেও উপায় নেই। অনেক কথা যে বলার আছে তোমাকে। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়ার আগে আমি তোমাকে সব সব সব কথা বলে যেতে চাই—উজাড় করে। যদি একবার কাছে পেতাম তোমাকে, খুব আদর করতাম। তখন আর এত কথা বলতাম না হয়তো।

কিন্তু তোমাকে আজকাল শুধু দূর থেকে দেখি। গত চারমাস তোমার বিয়ে হয়েছে। গত চারমাসে ঠাকুরপো,

কতদূরে সরে গেছ তুমি? কী করে পারলে গো!

তুমি কি জানো ঠাকুরপো, নন্দনকাননের সব গাছ মরে গেছে এই ক'মাসে। জল না পেয়ে, যত্ন না পেয়ে, আদর না পেয়ে মরে গেল তারা। আমাদের সাধের নন্দনকানন আদরের উপবাসে মরল ঠাকুরপো।

ঠাকুরপো, গত চারমাস তুমি তোমার নতুন বউকে নিয়ে ব্যস্ত। তোমার নতুনবউঠান এখন পুরাতন। আজকাল তুমিও তোমার জ্যোতিদাদার মতো বাড়ি ফের না। মাঝেমধ্যেই রাত কাটাও মেজবউঠাকরুণের বাড়িতেই। সেখানে যে চলছে তোমার বালিকাবধূর মাঝাঘষা, মেজবউঠাকরুণের নিজের হাতে। তোমার বন্ধ ঘরের দিকে তাকিয়ে কত বিকেল-সন্ধে-রাত কেটে যায় আমার। সব থেকে অসহ্য একলা আমার দুপুরবেলা। তোমার পায়ের শব্দ শুনতে পাই সারাক্ষণ। মনে হয়, এই বুঝি এলে তুমি, 'নতুন বউঠান, চলে এলাম তোমার কাছে', এ-কথা বলে আমার পাশে শুয়ে পড়লে।

ক'দিন আগে আর পারলাম না। ঢুকে পড়লাম তোমার ঘরে। ঢুকে দেখলাম পাথরের টেবিলে তোমার কবিতার খাতাটি উপুড় করে রেখে গেছ তুমি। যেন কোনও কবিতা লিখতে-লিখতে উঠে গেছ।

বুকের ভিতরটা টনটন করে উঠল। তোমার বিয়ের পরে

এ ক'মাস আর একটিও কবিতা পড়ে শোনাওনি আমাকে। ঠাকুরপো, তুমি তো বলেছিলে, আমার জন্যেই তুমি লেখো তোমার সব লেখা—তোমার লেখার মধ্যে লুকোনো থাকে অন্য লেখা, যা শুধু আমি পড়ব, আমি বুঝব—সে লেখা আর কারও জন্যে নয়।কেন মিথ্যে বলেছিলে ঠাকুরপো? এই ছলনার কি কোনও প্রয়োজন ছিল? প্রাণের রবি, আমি তোমাকে কখনও কোনও মিথ্যে বলিনি। আমার মধ্যে কোনও ছলনার আশ্রয় নেই। আমি পেয়েছি তোমার ভালোবাসা। ঠাকুরপো, আর কোনও মেয়ে এভাবে তোমার ভালোবাসা কখনও পাবে না হয়তো। আমার জীবন সার্থক। সেই ভালোবাসা হারিয়ে আমার বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না।

ঠাকুরপো, বলতে লজ্জা করছে—তবু, না বলেও পারছি না। আমি কখনও-কখনও লুকিয়ে-চুরিয়ে তোমার কবিতার খাতা পড়ি। আর তখন খুব কান্না পায় আমার। সবে বিয়ে করেছ তুমি। খুব স্বাভাবিক তোমার কবিতায় এখন অত আদর, এত শরীর ছড়িয়ে থাকবে। তবু...আমার খুব কান্না পায়, কষ্ট হয়, বুকের শিরায় টান ধরে, মনে হয় আমার অপমান এতদিনে সম্পূর্ণ হল।

তোমার একটি কবিতার নাম 'স্তন'। চমকে উঠলাম নাম দেখে। এ তো তোমারই হাতের লেখা। 'স্তন' শব্দটি ফুলের

মতো ফুটে আছে তোমার অনিন্দ্যসুন্দর হস্তাক্ষরে। তুমি লিখেছ ঃ

সহসা আলোতে এসে গেছে যেন থেমে—
শরমে মরিতে চায় অঞ্চল-আড়ালে।

এই লাইন দুটি আমার গলা চেপে ধরল। আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। একটি প্রশ্ন অসুখের মতন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত শরীরে—কোথাও কি ভাবনি তুমি আমার কথাও? একবারও না? আর একটি কবিতায় চোখ গেল আমার। কবিতার নাম 'চুম্বন'। তুমি লিখেছ ঃ

দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আদরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।

ঠাকুরপো, সত্যি কথা বলো, তোমার কি একবারও মনে পড়েনি নন্দনকাননে সেই বৃষ্টির আড়াল, সেই আদর, সেই নিবিড় আলিঙ্গন আর চুম্বন? এই লাইনগুলোর মধ্যে কি তোমার-আমার আদর এতটুকুও নেই ঠাকুরপো? বলো-বলো-বলো।

প্রাণের রবি, পাথরের টেবিলে তোমার খাতাটি উপুড় করা আছে দেখে মনে হল, না থাক, আবার তোমার লেখা পড়ে যদি কষ্ট পাই আমি। যদি আবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে বুকের

শিরা ছিঁড়ে যায়। কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা আমার আর নেই রবি। পরক্ষণেই মনে হল, হয়তো এমনকিছু লিখেছ যা আমার মন ভালো করে দেবে, যে-লেখার মধ্যে লুকোনো আছে অন্য লেখা, যে-লেখা শুধু তুমি-আমি পড়ব, সেই লেখা আর কেউ বুঝবে না।

আমি খাতাটি খুলতেই চোখে পড়ল এই দুটি লাইন ঃ

হেথা হতে যাও পুরাতন!

হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে!

পরের ঘটনা আমার কিছু মনে নেই। রবি, আমি কী করে তোমাদের ঘর থেকে আমার ঘরে এসেছিলাম, আজও মনে পড়েনি আমার। শুধু মনে আছে, যখন চেতনা ফিরল তখন রাত্তির হয়ে গেছে। আমি আমার বিছানায়। ঘর অন্ধকার।

ঠাকুরপো, কে ছিলেন আমার মা? তোমরা তাঁকে কখনও কোথাও দেখেছ? কখনও কি আমি পেয়েছি মায়ের আদর? চার কন্যার জন্ম দিয়েছিলেন আমার মা—বরদা আর মনোরমা, আমার দুই দিদি, আর শ্বেতাম্বরী, আমার ছোটবোন। আমি শ্যাম গাঙ্গুলির তিন নম্বর মেয়ে—শুধু বাবার নামেই আমার পরিচয়। কোথায় হারিয়ে গেলেন আমার মা? তাঁকে আমার মনেই পড়ে না। তোমার নতুনদাদাকে আমার মায়ের কথা কোনওদিন জিগ্যেস করতে সাহস হয়নি।

আমার বাবা, তাঁর সব অপমান সত্ত্বেও এক অর্থে তো

ঠাকুরবাড়িরই ছেলে। তাই এ-বাড়িতেই আমার জন্মের আগে তাঁর স্থান হয়েছিল। তাঁর বাসা ছিল জোড়াসাঁকোর বিরাট বাড়িটার নীচের তলায়, পায়রার খোপের মতো একটি ঘরে। আমার জন্ম কোথায় ঠাকুরপো? হাড়কাটা গলিতে? না কি তোমাদের বাড়ির নীচের তলায়, যেখানে তোমরা আশ্রয় দিয়েছিলে গরিব আত্মীয়স্বজনদের?

ঠাকুরপো, আমি তোমাকে দেখতাম দূর থেকে। তুমি নামতে না নীচের তলায়। কোনওদিন আসনি আমাদের বাড়ি। কেনই বা আসবে। কত বড় ধনী পরিবারের ছেলে তুমি। তুমি তখন বছর ছয়টয় হবে। আমি আট। তোমাকে দেখতাম দূর থেকে। দক্ষিণের বারান্দায় রেলিং ধরে তুমি দাঁড়িয়ে থাকতে। তোমার দৃষ্টি থাকত আকাশ পানে। মাঝে-মাঝে তুমি খেলা করতে বাগানে। ইচ্ছে করত তোমার সঙ্গে গিয়ে খেলা করি।

একদিন তখন তুমি আমার খুব বন্ধু, সেই যখন নন্দনকানন করছি দু'জনে মিলে, তুমি বিলেত থেকে ফেরার পরেই, তখন তোমাকে জিগ্যেস করেছিলাম, ঠাকুরপো, আমাকে মনে পড়ে তোমার, কেমন ছিলাম আমি এ-বাড়ির বউ হওয়ার আগে, তোমাদের নীচের তলায়?

কথাটা শুনেই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেলে তুমি। কুঁকড়ে গেলে ভিতর থেকে। শুধু বললে, 'মনে তো পড়ে না কিছু।'

আমি বললাম, 'কিছু মনে পড়ে না? আমি নীচের তলা থেকে দেখতাম তোমাকে, তুমি যখন এসে দাঁড়াতে দক্ষিণের বারান্দায়। একদিন তোমাকে দেখে হাত নেড়েছিলাম। মনে পড়ে তোমার?'

তুমি বললে, 'নীচের দিকে দেখতামই না আমি। আমি তো আকাশ দেখতাম। তোমার আকাশ দেখতে ভালো লাগত না?' আমি বললাম, 'আমার ঘর থেকে আকাশ দেখা যেত না। আমার তো তোমার মতো বারান্দা ছিল না ঠাকুরপো।'

হয়তো আমার কথা শুনে খুব কষ্ট হয়েছিল তোমার। কোনও কথা বললে না। নন্দনকাননের চাঁপা গাছ থেকে একটা স্বর্ণচাঁপা তুলে হঠাৎ গুঁজে দিলে আমার খোঁপায়।

প্রাণের ঠাকুরপো, যে-অবস্থার মধ্যে কেটেছিল আমার শৈশব সেখানে কোনওদিন পৌঁছয়নি তোমাদের বড় বাড়ির কোনও রোশনাই। হাসি, গান, আনন্দ। ঠাকুরবাড়ির ফরমাশ খাটা বাজার সরকারের কালো রোগা মেয়েটার জীবনের সঙ্গে তোমার জীবনের কোনও মিল ছিল না, তোমার নতুনদাদার সঙ্গে আমার বিয়ের আগে।

হঠাৎ ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে এসে পড়েছিলাম তোমাদের অন্দরমহলে। এসে দেখলাম কী এলাহি ব্যাপার! ছেলেমেয়ে জামাই-বউ, নাতি-নাতনি, দাসদাসীতে বাড়িটা গমগম করছে।

কে কার কী, কার সঙ্গে কার কী সম্পর্ক, এ বুঝে উঠতে আমার বেশ সময় লেগেছিল। একটা কথা বুঝতে অসুবিধে হয়নি—ঠাকুরবাড়িতে প্রতিদিনই যেন উৎসব। বাড়ির রান্নাঘরে দশ-বারোজন বামুনঠাকুর ভোর থেকে রান্না চড়ায় গনগনে উনুনে। রান্নার ব্যবস্থাও দু-রকমের। একটা 'সরকারি'। একটা 'বেসরকারি'। ঘরে-ঘরে যে-রান্না বামুনঠাকুরেরা পৌঁছে দেয়, সেটা 'সরকারি' রান্না। কিন্তু প্রতি মহলে ঘরে-ঘরে তো লোক! প্রত্যেকের রুচি আলাদা। সুতরাং প্রতি মহলের জন্যে তোলা উনুনে স্বামী ও স্ত্রীদের ফরমাশ অনুসারে কিছু বিশেষ রান্নাও হয়। সেটা 'বেসরকারি' রান্না। এসব দেখে আমি তো তাজ্জব। তোমার নতুন দাদার খাওয়ার রুচি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার ওপর ভার পড়ল তাঁর রুচি অনুসারে রান্না করার। রান্নার তখন আমি কিছুই জানতাম না। ধীরে ধীরে শিখতে হল সবই। আমার একেবারেই ভালো লাগেনি ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার ঘরে বৈঠকি আড্ডা। তরকারি কোটার আসরে সবাইকে থাকতে হত। আমিও থাকতাম। আমার মন পড়ে থাকত তোমার কাছে ঠাকুরপো। সেই ভাঁড়ার ঘরের অড্ডাতেই ঠাকুরবাড়ির মহিলামহলের কত খোঁটা কত গঞ্জনা যে আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। প্রথম প্রথম আমার সন্তান হল না বলে গঞ্জনা—আমি বাঁজা, এই বাঁজা বউকে বিয়ে করে তোমার নতুন দাদার কত হতাশা, কত যন্ত্রণা, এসব

কথা যে কতভাবে আমি শুনেছি। তারপর এল তোমার-আমার সম্পর্ক নিয়ে গুঞ্জন—তোমাকে সাহস করে যে-কথা কেউ বলতে পারতেন না, বলতেন আমাকে। আমিই নাকি তোমাকে নষ্ট করছি, তোমার মাথা খাচ্ছি!

প্রাণের ঠাকুরপো, দেখলে তো গুছিয়ে লেখা আমার পক্ষে সম্ভবই নয়, বিশেষ করে মনের এই অবস্থায়। যত বেলা বাড়ছে, ততই যে এগিয়ে আসছে আমার চিরবিদায়ের মুহূর্ত, আরও বিপন্ন, বিষণ্ণ হয়ে পড়ছে মন, দিশেহারা হয়ে যেকথা বলতে চাই, তার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি বারবার। আমার তো আর বেশি সময় নেই। অথচ সব কথা যে বলতেই হবে তোমাকে—হে আমার প্রিয়তম পুরুষ, প্রিয়তম বন্ধু, আমার চিরসখা, তোমাকে না বলে যে আমি মরতে পারব না।

আমার রবি, কতই বা তখন বয়েস হবে তোমার। তখন তো তুমি একরত্তি বালক, বয়েস এই সাতটাত হবে। আমার কিন্তু তখন বেশ বয়েস, আমার বিয়ের দিনেই তো আমি নয়ে পড়লাম। ১৮৬৮-র ৫ জুলাই ছিল আমার ন'বছরের জন্মদিন। হিন্দুরা বলে, জন্মদিনের দিন বিয়ে করতে নেই। তা, তোমরা তো হিন্দু নও, ব্রাহ্ম। ওসব কুসংস্কার তোমাদের নেই। তবে আসল কথাটা হল, সেদিন যে আমার জন্মদিন, সে কথাটা কেউ মনেও রাখেনি। ওই দ্যাখো, এবার মনে

পড়ল আমার মায়ের কথা, ওই তো আমি দেখতে পাচ্ছি, আবছা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক কোণে, বলছেন জন্মদিনে বিয়ে দিলে সে-বিয়ে শুভ হয় না। ঠাকুরপো, এবার সব মনে পড়েছে আমার—মায়ের নাম ত্রৈলোক্যসুন্দরী। যাঁর কথা কেউ শুনল না, আমার বিয়েতে যাঁর কোনও ভূমিকাই নেই, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলে যাঁর কোনও পরিচয় নেই তাঁর কত বড় নাম—ত্রৈলোক্যসুন্দরী। কোথায় হারিয়ে গেলেন চারকন্যার সেই জননী, আমার মা। আমার ঠাকুরদা জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরবাড়ির দারোয়ান। তোমাদের বাড়ির ফটকেই তাঁর চিরস্থায়ী আসন ছিল পাতা। আমার দাদামশাইয়ের নাম শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরবাড়িতে তাঁর কোনও পরিচিতিই নেই।

এই দ্যাখো! আবার পিছলে গেছে আমার লেখা। যেকথা বলছিলাম, ১৮৬৮-র ৫ জুলাই, আমার জন্মদিনে তোমার উনিশ বছরের নতুনদাদার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কী দুর্লভ সৌভাগ্য আমার, ঈশ্বরের কত বড় আশীর্বাদ আমার ওপর, আমি, যার বিদ্যে তখন প্রথম ভাগও পেরয়নি, আমি এক গরিবের কালো রোগা মেয়ে, হয়ে গেলাম ঠাকুরবাড়ির বিদ্বান, অপূর্ব রূপবান, অভিজাত যুবক, গানে-বাজনায়-লেখায় সরস্বতীর বরপুত্র স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী!

প্রায় প্রথম দিন থেকে শুরু হয়ে গেল আমাকে তোমার

নতুনদাদার যোগ্য করে গড়ে তোলার চেষ্টা। আমার জন্যে কেনা হল প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ধারাপাত। আমাকে ঘষেমেজে তৈরি করার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন মেজবউঠাকরুণ জ্ঞানদানন্দিনী। আমার মোটেই ভাল্লাগতো না এসব। ভাল্লাগতো শুধু তোমার সঙ্গে ধারাপাত পড়তে। তোমার সঙ্গে প্রথম বাঁধা পড়েছিলাম ধারাপাতের সুরে।

প্রাণের রবি, আমি ক্রমশ হয়ে উঠলাম তোমাদের বাড়ির বউ। আমার একমাত্র পরিচয়, আমি তোমার নতুনদাদার স্ত্রী। তুমি আমাকে কী মিষ্টি করে ডাকলে—নতুনবউঠান। আমার জীবনে সারা দিনরাত ধরে একটাই চেষ্টা—কী করে হয়ে উঠব জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের যোগ্য স্ত্রী!

আমার বাবা-মা পড়ে থাকলেন, আমার দৃষ্টিপথ থেকে অনেক দূরে, তবু একই বাড়ির বারমহলে—আমি যে-বাড়ির বউ! খবর পেতাম, বাবা কখনও খাটছেন তোমাদের বাগানে পাঁচিল তোলার ফরমাশ, কখনও বা 'দুরস্ত' করছেন আমার শাশুড়িঠাকরুণ, তোমার মায়ের বিছানা। আমার মা যে ক্রমশ কোথায় হারিয়ে গেলেন, আমি অন্তত জানি না। ক্রমেই বুঝতে পারলাম ঠাকুরপো, আমি যতই চেষ্টা করি না কেন, মেজবউঠাকরুণের চোখে আমি এ-বাড়ির বাজার সরকারের

মেয়ে ছাড়া আর কিছুই নই। এই পরিচয় থেকে, এই সামান্যতা থেকে আমার মুক্তির কোনও উপায় নেই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যোগ্য স্ত্রী হওয়া এ-জীবনে আমার পক্ষে যে সম্ভব নয়, এ কথাটা ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহল এতদিন ধরে ক্রমাগত আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে। সারা ঠাকুরবাড়িতে আমি একটিই প্রাণের মানুষ পেয়েছিলাম রবি। সে-মানুষ তুমি! তুমি বুঝেছিলে আমার দহন। আমার সকল কষ্ট সহ্য হয়। তোমার দেওয়া কষ্ট আমি সহ্য করতে পারি না—কেন তুমি লিখলে ঃ

চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,
হেথায় আলো নাহি, অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।

তোমার কথাই আমি মাথা পেতে মেনে নিলাম রবি। আমার সামনে অনন্ত আঁধার। রবিহীন নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমি তোমারই নির্দেশে সেই দিকে পা বাড়ালাম।

রবি, তখন তুমি বিলেতে। মনে হচ্ছে কত বছর তোমাকে দেখিনি। তোমার ফিরে আসার দিন গুনে কাটছে আমার রাতদিন। একদিন কুটনোকোটার আসরে মেজবউঠাকরুণ বললেন—

'নতুনের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। কী যে একটা বিয়ে হল ওর। কোথায় নতুন আর কোথায় তার বউ! এ বিয়েতে মনের মিল হওয়া সম্ভব নয়। স্ত্রী যদি শিক্ষাদীক্ষায় এতটাই নীচু হয়, সেই স্ত্রী নিয়ে ঘর করা হয়তো যায়, সুখী হওয়া যায় না। নতুন তো আমার কাছেই সারাক্ষণ পড়ে থাকে। গান-বাজনা-থিয়েটার নিয়ে আছে, তাই সংসারের দুঃখটা ভুলে আছে।'

কথাগুলো এক নিশ্বাসে বলে গেলেন মেজবউঠাকরুণ। তারপর কেউ একজন ফোড়ন কাটলেন। এবার মেজবউঠাকরুণ বললেন আমাকে নিয়ে তাঁর আসল হতাশার কথা—

'আমি তো নতুনের যোগ্য পাত্রী দেখেছিলাম। আমার স্বামীর বন্ধু ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলেতফেরত মেয়ে। নতুনের পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু সে-বিয়ে হল কোথায়? নতুনের ভাগ্যে নেই, হবে কোথা থেকে!'

মেজবউঠাকরুণের এ-কথাটা ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলে রটে গেল হু-হু করে। ডাক্তার সূর্যকুমার চক্রবর্তীর বিলেতফেরত মেয়ের গুণাবলির কথা কতভাবে যে আমার কাছে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে শুনতে লাগলাম আমার জন্যে ঠাকুরবাড়ির হতাশার নিশ্বাস। সত্যিই তো ঠাকুরপো, কোথায় সূর্যকুমারের

বিলেতফেরত মেয়ে, আর কোথায় ঠাকুরবাড়ির বাজার সরকারের মেয়ে। আমি ক্রমশ হয়ে উঠলাম ঠাকুরবাড়ির করুণার পাত্রী।

ঠাকুরপো, ঠাকুরবাড়ির রূপকুমার, সত্যিই রূপেগুণে জ্যোতির্ময় স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী হওয়ার কোনও যোগ্যতাই ছিল না আমার—কোনওদিন সেই যোগ্যতা অর্জন করতেও পারিনি, তবু কেন তাঁর সঙ্গে বিয়ে হল আমার? সেই কথাটা কেউ কিন্তু ভেবেও দেখল না। ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে তোমার নতুনদাদার বিয়েই যে হত না। আমিই ছিলাম তোমাদের সবচেয়ে সহজ মুক্তির উপায়, হাতের কাছেই ছিলাম আমি, তোমাদেরই বাড়ির গরিবমহলে, নীচের তলায়। কে বাবামশায়ের কানে আমার কথাটা তুলেছিল জানি না। আমার ভাগ্য, আমার নিয়তি। বাবামশায়ের আদেশ গেল তোমার নতুনদাদার কাছে, আমাকে বিয়ে করার জন্যে। তখন যে সূর্যকুমারের মেয়ের কথা তাঁকে জানানো হয়নি, তা হয়তো নয়। কিন্তু তিনি কান দিলেন না। আমার মতো সহজলভ্য আর কে ছিল বলো?

ঠাকুরবাড়ির পুরুষ—সে-পুরুষ যতই হোক রূপবান, গুণবান, যেমন তোমার জ্যোতিদাদা, যেমন তুমি নিজে,—সেই পুরুষের বউ পাওয়া খুব সহজ নয়। ঠাকুরপো, মাত্র চারমাস তোমার বিয়ে হয়েছে। এখন তুমি তোমার নতুন বউ

নিয়ে বেশ আচ্ছন্ন—তাই তো স্বাভাবিক। পুরাতনকে বিদায় জানিয়েছ তুমি। নতুনই তোমার সব। কিন্তু একদিন তোমারও মনে হবে ঠাকুরপো, তুমি সেই বাবামশায়ের নির্দেশেই বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছ অনেক নীচের তলায়। তোমার স্ত্রীর বাবা ঠাকুরবাড়িরই কর্মচারী,—তোমার যোগ্য স্ত্রী কি তুমি পেলে ঠাকুরপো?

অর্থ, আভিজাত্য, রূপ-গুণ কোনও কিছুর জন্যেই হিন্দু ঘরের তেমন মেয়ে তোমাদের ঘরে আসবে না—যে মেয়ে বংশ-মর্যাদায়, শিক্ষাদীক্ষায় তোমাদের সমান-সমান। কারণ তোমরা তো হিন্দু নও। ব্রাহ্ম। যে-শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে হিন্দু বিয়ে হয়, সেই শালগ্রাম শিলাই তোমরা মানো না! তার ওপর তোমরা আবার মুসলমানের জল খাওয়া একঘরে পিরালি ব্রাহ্মণ! এক কথায়, তোমাদের কোনও হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারই ব্রাহ্মণ ভাবে না। সুতরাং সেই পরিবার তোমাদের চট করে মেয়ে দেবে কেন?

আমার পরম সৌভাগ্য কিংবা অমোঘ নিয়তি, আমাকে তোমরা পেয়ে গেলে হাতের কাছে। আমার বাবার তো আর না বলার ক্ষমতা নেই। স্বয়ং বাবামশায়ের আদেশ—তোমার জ্যোতিদাদারই প্রতিবাদ করার সাহস হল না। আমার বয়েস তখন মাত্র নয়। তিনি উনিশ। বিদ্যায়-বুদ্ধিতে কত এগিয়ে আমার চেয়ে। সত্যিই তো, কত বড় ভাগ্য আমার—

বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, কোনও যোগ্যতা ছাড়াই ঠাকুরবাড়ির বউ, স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্রিনাথের স্ত্রী হয়ে গেলাম আমি—শুধুমাত্র আমার সহজলভ্যতার যোগ্যতায়, শুধুমাত্র তোমাদের কনে খোঁজার পরিশ্রম সহজে মিটিয়ে দিতে।

রবি, আমার প্রাণের রবি—আমার সব দুঃখ, সব পরাজয় আর অপমান একদিকে। আর একদিকে তুমি। ঠাকুরবাড়িতে আমার একমাত্র পাওয়া তুমি, তুমি ঠাকুরপো, শুধু তুমি। ন'বছর বয়সে এ-বাড়িতে এসে তোমাকে পেলাম আমার খেলার সাথি, আমার দোসর। বালিকাবেলা থেকে যখন পৌঁছলাম কৈশোরে, যখন আমার শরীর-মন হয়ে উঠল অন্যরকম, যখন বদলে গেল আমার ইচ্ছের রং, তোমাকে তখন পেলাম আমার বন্ধু। আমার একমাত্র বন্ধু। আমার প্রতি ঠাকুরবাড়ির সমস্ত অবহেলা, সব চাপা ঘেন্নার যেন প্রতিশোধ নিলে তুমি—আমার পরম পুরুষ। যদি কেউ কখনও বুঝে থাকে আমার দহন, সে তুমি। আমার মনে আছে, নন্দনকাননে অন্ধকার রাত্তিরবেলা আমাকে জড়িয়ে ধরে তুমি বললে, নতুন বউঠান, কী তোমাকে দহিছে, আমি জানি। তোমার মতন করে কথা বলতে এ-বাড়িতে কেউ পারে না। তোমার কথা শুনে, তোমার বুকের আশ্রয়ের মধ্যে সে-রাতে আমার মনে হয়েছিল, সত্যিই আমার অন্তরের সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে বৃষ্টি এল। মনে হয়েছিল—তুমি আমার চিরকালের। মনে

হয়েছিল, না না বিশ্বাস হয়েছিল ঠাকুরপো—তোমার ওই মন, যে-মন বোঝে আমার অপমান, যে মন অনুভব করে আমার একাকিত্ব, যে মন সব সময়ে ছুঁয়ে থাকে আমার মন—সেই মনটাকে আমি চিরকালের জন্যে পেয়েছি। সেই মনের ওপর আর কোনও অধিকার নেই—এই বিশ্বাসের জোরেই আমি বেঁচেছিলাম।

ঠাকুরপো, মনটা আবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। কখন যে আমার জীবনের শেষ দিনের এতটা সময় কেটে গেল! এখন দুপুরবেলা, আমার ঘরের জানলা দিয়ে দেখতে পেলাম বামুনঠাকুর তোমাদের ঘরে দিয়ে গেল মধ্যাহ্নের খাবার—তুমি আজকাল তোমার নতুন বউকে নিয়ে নিজের ঘরেই খাও। তোমার নতুন জীবন এই চারমাসে কত বদলে দিয়েছে তোমাকে। আগে আমার হাতের রান্না ছাড়া তোমার মন ভরত না। কিছু না কিছু রাঁধতেই হত তোমার জন্যে। এখন বামুনঠাকুরের রান্নাতেই তুমি খুশি। তোমার জ্যোতিদাদা অবিশ্যি এবাড়ির রান্না মুখে দেন না। তিনি থাকেনই বা কখন যে খাবেন? ভুলেই গেছি কবে তাঁকে দেখেছি। তিনি মেজবউঠাকরুণের বাড়িতে বেশি আরাম পান—ওঁদের বাড়ির সাহেবি রান্নাতেই তাঁর তৃপ্তি বেশি।

ঠাকুরপো, আমার আজ উপোস। রান্নাঘরে সে-খবর

পাঠিয়ে দিয়েছি সকালবেলা। আজ আমার দরজা বন্ধ। এ-দরজা আমি বন্ধ করেছি। খুলব না আমি। তোমরা খুলো—আমার মৃত্যুর পরে। সেই রুদ্ধদুয়ার খোলার অভিজ্ঞতা থেকে হয়তো তোমার মধ্যে জন্ম হবে কোনও লেখা কোনওদিন—কে বলতে পারে! আমি থেকে যাব তোমার সেই লেখার আড়ালে।

ঠাকুরপো, আজ আমার ঘরে কেউ আসবে না। কেউ না। আজ মৃত্যুব্রত পালন করছি আমি। একই সঙ্গে বেদনা আর আনন্দ বাজছে হৃদয়ে আমার। আজ আমার নির্জলা উপবাস—যাতে ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ি আমি, যাতে মরতে তেমন কষ্ট না হয়।

আবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে ভাবনা। ঝিমঝিম করছে মাথার মধ্যে। তবু লিখছি। আমি যে লিখছি তা ঠিক নয়। কেউ একজন লিখিয়ে নিচ্ছে এসব কথা আমাকে দিয়ে। মনে পড়ে গেল কয়েক বছর আগের কথা। কিন্তু তার আগে অন্য একটা কথা তোমাকে বলি। খুব তেষ্টা পাচ্ছে আমার। ঘরের কোণে পাথরের টেবিলটার ওপর কুঁজো ভরতি জল। কিন্তু এক ফোঁটাও জল খাব না—যতই তেষ্টা পাক। জল খেলেই আমার ব্রত যে ভেঙে যাবে। বরং টেবিলের ওপর মাথা রেখে একটু জিরিয়ে নিই ঠাকুরপো—মাথাটা এত ঝিমঝিম করছে কেন বলো তো?

*

সামান্যই ঘটনা, তবু মনে পড়ে গেল। গত চারমাস শুধু এইরকম কত ঘটনা মনে করে-করে বেঁচে থাকলাম আমি। শুধুই স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকা। বর্তমান যেন থেমে গিয়েছে আমার জন্যে। শুধু মনে পড়ে, মন কেমন করে, অতীতই হয়ে ওঠে বর্তমান—বেঁচে ছিলাম সেইভাবেই। তোমার বিয়ের পরে চারটে মাস আমার কেটেছে অতীতে। ক্রমশ মনে হল, কী লাভ অতীতের মধ্যে বেঁচে থেকে। এরচেয়ে মরে যাওয়াই তো ভালো।

যে-ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছিলাম—একদিন বিকেলবেলা জানলার ধারে চুপ করে বসে মালা গাঁথতে-গাঁথতে ঘুমিয়ে পড়েছি, তুমি এলে আমার ঘরে।

আমার উড়ুক্কু চুলগুলি কপাল থেকে সরিয়ে আমার পিঠের ওপর হাতটি রেখে নরম করে ডাকলে, নতুনবউঠান।

আমি তাকালাম তোমার পানে। তুমি বললে, যেভাবে এ-ভুবনে শুধু তুমিই বলতে পারো, মনে হল কবিতা, মনে হল গান, মনে হল প্রেম—আমাকেই নিবেদন করলে তুমি।

ভেবেছিলাম হয়তো বা ভুলে গেছি। কিন্তু ভোলা কি যায় ঠাকুরপো। তোমার কথাগুলি যে ঝরে পড়ছিল ফুলের মতো আমার মনোভূমিতে।

তুমি বললে, 'নতুনবউঠান, মালা গাঁথতে-গাঁথতে জানলার কাছে বসে কার কথা ভাবছ অমনভাবে করতলে রাখি মাথা? তোমার কোলে ফুল পড়ে রয়েছে, তুমি ভুলে গেছ মালা গাঁথা!' ঠাকুরপো, তোমার হাতটিকে আমার গালের উপর চেপে বলেছিলাম, 'তোমারই জন্যে মালা গাঁথছি ঠাকুরপো, তোমারই কথা ভাবতে-ভাবতে ভুলে গেছি মালা গাঁথতে।'

তুমি বললে, 'আমার কথা ভেবে মালা গাঁথতে ভোলোনি। ভুলেছ ওই যে ঝুরু ঝুরু বায়ু বহে যায় আর কানে কানে কী যে কহে যায়—সেই জন্যে। ওই যে চোখের ওপর ভেসে যাচ্ছে মেঘ, উড়ে যাচ্ছে পাখি আর সারাদিন ধরে বকুলের ফুল ঝরে পড়ছে থাকি-থাকি, ভুলেছ সেই জন্যে।'

আমি তোমার কথা শুনে কেমন বিহ্বল হয়ে গেলাম। তুমি আমার আদ্দেক গাঁথা মালাটি নিলে আমার কোল থেকে তুলে। দিলে আমার বেণীর সঙ্গে জড়িয়ে। তারপর একটু নীচু হয়ে কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'নতুনবউঠান, লোভন হয়েছে গ্রীবাটি তোমার।' আচমকা তোমার ঠোঁট আদর করল আমার উন্মুখ গ্রীবা। তুমি আমার কানে-কানে বললে, 'নতুন বউঠান, তোমার এই মধুর অলস, এই মধুর আবেশ, মধুর মুখের এই হাসি—আমার প্রেমের মধ্যে থেকে গেল তাদের মূল্যের পরিমাণ।'

ঠাকুরপো, আমার হাসি, যার জন্যে তুমি সত্যিই পাগল

হয়ে গিয়েছিলে একদিন, সেই হাসি দেখার জন্যে তোমার কত না কথা, কত দুষ্টুমি, ফন্দি, কৌতুক,—সত্যি করে বলো ঠাকুরপো সেই হাসির কথা তোমার আজও মনে পড়ে?

তুমিই তো একদিন আমাকে বলেছিলে, 'ধীরে ধীরে প্রাণে আমার এসো হে, মধুর হাসিয়ে ভালোবেসো হে।' সেই গান আর একদিন তোমার নতুন বউয়ের দিকে তাকিয়ে তুমি গাইতে পারলে! মনে পড়ে, দক্ষিণের বারান্দায় সেদিন কেউ ছিল না। শুধু তুমি আর আমি। বিকেলবেলা গা ধুয়ে ছাদে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছি, তুমি এলে ছুটে। আমার চিবুক ধরে মুখটি তুলে ধরলে। আমার দৃষ্টি আটকে গেল তোমার চোখে।

তুমি কী বলেছিলে ভুলিনি। বলেছিলে, 'তোমার এই চকিতের চাউনির দান সংসারের আর সমস্তকে ছাড়িয়ে আমারই হাতে এসে পৌঁছেছে। নতুনবউঠান, একে আমি রাখব গানে গেঁথে, ছন্দে বেঁধে। আমি একে রাখব সৌন্দর্যের অমরাবতীতে।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরপো, আমার চোখের জলে সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে। মেঘের সকল সোনার রং যে-সন্ধ্যায় মিলিয়ে যায়, একদিন সেই চাউনিও সেই সন্ধ্যায় মিলিয়ে যাবে। হাজার কথার আবর্জনা, হাজার বেদনার স্তূপে তুমি আজকের

এই মুহূর্তটিকেও হারিয়ে ফেলবে একদিন।'

তুমি আমার কথার উত্তরে তেমন কিছুই বললে না। বললে অনেক রাতে, ছাদের অন্ধকারে। কী বলেছিলে আজ তোমার মনে নেই। বলেছিলে, 'নতুনবউঠান, আমি চাইনে রাজার প্রতাপ। আমি চাইনে ধনীর ঐশ্বর্য। তোমার চোখের মায়াই আমার চিরদিনের ধন। তাই দিয়েই আমি অসীমের গলার হার গাঁথি।'

বন্ধু, কত কথা যে মনে পড়ছে। যত এগিয়ে আসছে সময়, ততই যেন কোনও কোনও মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করছে। আবার এই মুহূর্তগুলোর জন্যই বেঁচে থাকার কষ্ট আর সহ্য করার শক্তি নেই আমার। মনে পড়ছে সেই দুপুরবেলাটি। বৃষ্টি পড়ছে সকাল থেকে। কখনও-কখনও কমে আসছে বৃষ্টি। আবার দমকা হাওয়া তাকে মাতিয়ে তুলছে।

ঘরে দিনের বেলাতেই বাতি জ্বালিয়ে রেখেছি। হাওয়ার দাপটে কাঁপছে তার শিখা। কিছুতেই কাজে মন যাচ্ছে না। হঠাৎ তুমি তোমার ঘরে বর্ষার গানে লাগালে মল্লারের সুর।

তখন তোমার-আমার জীবন ছিল অন্যরকম। তখন তোমার ঘর ছিল শুধু তোমারই ঘর। সেই ঘরে আমার গতিবিধি ছিল অবাধ। কোনও কুণ্ঠার পরদা ছিল না মাঝখানে।

তোমার মল্লার আমাকে ডাকল। যেমন করে গাইছিল আকাশ, ঠিক তেমনি করেই গাইলে তুমি। পাশের ঘর থেকে একবার এলেম তোমার দুয়ার পর্যন্ত।

আবার ফিরে গেলাম। আবার একবার বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তারপর তোমার মগ্ন মল্লারের টানে ভিতরে না এসে পারলাম না। ধীরে ধীরে ভিতরে এসে বসলাম তোমার পাশটিতে। তোমার মনে আছে ঠাকুরপো? না কি সব ভুলে গেছ?

হাতে ছিল আমার সেলাইয়ের কাজ। আমি মাথা নীচু করে তোমার পাশে বসে সেলাই করতে লাগলুম। তোমার আকাশের মতো গান, তার সমস্ত মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়-বিদ্যুৎ নিয়ে, আমার সমস্ত শরীরের ওপর ছড়িয়ে দিল আদর। এমন আদর তোমার কাছ থেকে আমি কোনওদিন পাইনি।

বৃষ্টি ধরে এল। তোমার গান থামল। আমি আমার সেলাই বন্ধ করে জানলার বাইরে ঝাপসা গাছগুলোর দিকে চেয়ে রইলুম। মনে হল, আমার জীবনের মতোই ঝাপসা ওরা।

তারপর একটিও কথা না বলে আমি আমার ঘরে ফিরে এলাম চুল বাঁধতে। ঠাকুরপো, সেদিন আমি গা ধুইনি। পাছে ধুয়ে যায় তোমার আদর। যেমন ধুয়ে যায় নাগকেশরের সোনালি রেণু বৃষ্টিতে।

ঠাকুরপো, আমি তোমাকে চিনি, জানি, কাছে পেয়েছি,

ভালোবেসেছি সতেরো বছর ধরে।

কেমন করে তোমাকে ছেড়ে থাকব ঠাকুরপো? তুমি বিলেত চলে যাবে, তোমাকে ছেড়ে থাকতে হবে, কেমন করে সেই যন্ত্রণা ঠাকুরবাড়ির বন্ধুহীন পরিবেশে আমি সহ্য করব—সে-কথা ভেবে আমি চেষ্টা করেছিলাম আত্মহত্যার। কিন্তু মরতে পারিনি। তোমারই জন্যে হয়তো পারিনি ঠাকুরপো।

এবার পারব তো? মৃত্যুর পরে তোমাকে ছেড়ে থাকব কেমন করে ঠাকুরপো?

তোমার বিয়ের কথা যখন সব পাকা হয়ে গেল, যখন আর ফেরবার পথ নেই তোমার, যখন আমি জানলাম, তোমাকে হারিয়েছি আমি চিরদিনের জন্যে, আমার রবি এখন অন্যের, আমার সঙ্গে এলে দাবা খেলতে।

আমার সঙ্গে দাবার খেলায় জিততে পারতে না কখনও। ভাব দেখাতে যেন ইচ্ছে করেই হেরেছ।

আমি বললাম, 'আমি হেরে গেছি রবি। আর আমি খেলব না।'

তুমি বললে, 'তুমিই তো জিতে গেলে বউঠান। আমার জীবনটাই হয়ে যাবে ওলোটপালোট। নতুন বউঠান, তুমি তবু একলা থাকতে পারবে এত বছরের তোমার-আমার কত আসাযাওয়ার, কত দেখাদেখির, কত বলাবলির, তারই আশেপাশে কত স্বপ্ন, কত অনুমান, কত ইশারার স্মৃতি নিয়ে।

আমার জীবন থেকে একাকিত্বের সেই গৌরবটুকুও হারিয়ে যাবে। ইচ্ছে করলেও আমি তোমার চোখের শুকতারার আলো, তোমার চুলের চামেলি ফুলের গন্ধ, তোমার হাসির ইশারার স্মৃতির সঙ্গে একলা হতে পারব না। নতুন সম্পর্কের চাহিদার ভিড়ে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবে।'

ঠাকুরপো তোমার কথা শুনে আমার চোখে জল এল। কিছুতেই লুকিয়ে রাখতে পারলাম না বেদনা।

তুমি আমার ঘরে খাটে এসে বসে রইলে অনেকক্ষণ। তারপর হঠাৎ আমার হাত দুটি তোমার বুকে চেপে ধরে বললে, 'কতভাবে তুমি আমার নাম ধরে ডেকেছ বউঠান! ওই নামে, ওই ডাকে যে-মানুষ এতকাল সাড়া দিয়েছে সে তো শুধু বিধাতার রচনা নয়। নতুনবউঠান, সে-মানুষ যে তোমারও রচনা।'

আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। ভেঙে পড়লাম কান্নায় তোমার বুকের ওপর।

তোমার কথাগুলি মিশে গেল তোমার গভীর আলিঙ্গনে। আমার মনে আছে সেই কথা, 'নতুনবউঠান, কখনও আদরে, কখনও অনাদরে, কখনও কাজে, কখনও অকাজে, কখনও সবার সামনে, কখনও একলা আড়ালে, কেবল একটি মানুষের মনে মনে জানা দিয়ে গড়া এই আমি! আর যে-মানুষটি এত বছর ধরে আমাকে গড়ল, সে তুমি বউঠান, সে তুমি।'

ঠাকুরপো, সেদিন তোমার কথার উত্তরে কোনও কথা বলতে পারিনি আমি। বেদনার আচ্ছন্নতায় ডুবে গিয়েছিলাম। আজ যাওয়ার বেলায় তোমাকে বলি, 'এই যে তোমাদের সতেরো বছরের জীবন, কত মনে পড়া, কত টাটকা গন্ধ, কত ক্লান্ত সুর, কত বৃষ্টির মতো আদর,—এসব থাকবে কোথায়? তুমি তো আর তাদের ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরে রাখতে পারবে না। ঠাকুরপো, আমার সঙ্গে তাদেরও বিদায় জানিও। ওরা উড়ে চলে যাক বাতাসে। ওদের আর খুঁজতে বেরিও না।'

রবি মনে আছে তোমার, তুমি পানতাভাত খেতে ভালোবাসতে? চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতাভাত! ইস্কুল থেকে ফিরেই খুব খিদে পেত তোমার। তখন খেতে পানতাভাত। আর খেতে দিতে হত আমাকে। না হলে তোমার মুখে রুচত না।

বিলেত থেকে ফিরেই তুমি খেতে চাইলে পানতাভাত আর চিংড়ি চচ্চড়ি। আমি তো অবাক। বললাম, 'ঠাকুরপো, কত ভালো ভালো রান্না খেয়ে এসেছ, মেমসাহেবদের হাতের রান্না, এখন কি আমার তৈরি পানতাভাত আর চিংড়ির চচ্চড়ি তোমার ভালো লাগবে?'

তুমি হেসে বললে, 'নতুনবউঠান, সারা ভুবন ভ্রমিয়া যে-স্বাদ পাইনি সে তোমার মেখে দেওয়া পানতাভাতের স্বাদ। ঠিক যেমন দিতে ছেলেবেলায় তেমনি দাও তো, চিংড়িমাছের চচ্চড়ির সঙ্গে পানতাভাত অল্প একটু লঙ্কার আভাস দিয়ে। ওই আভাসটুকু যেন হয় তোমার হাতের। অমন আর কেউ পারে না নতুনবউঠান।'

কত কথা যে মনে পড়ছে ঠাকুরপো! এলোমেলোভাবে। তা হোক। মনটা আলগা করে দিয়েছি। জীর্ণ মনটা নিজেকে হালকা করুক। ভার বহন করতে আর যে পারছে না। তুমি যাকে বলতে, 'নীচের তলার চোরাকোনা দেয়ালের প্যাকবাক্স', যেখানে আমাদের মতো গরিব আত্মীয়স্বজন আটক পড়েছে, সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে যখন ঠাকুরবাড়ির বউ হয়ে এলাম তোমাদের বাড়ির অন্দরমহলে, দেখলাম এ-বাড়ির চালচলন একেবারে অন্যরকম। ক্রমশ সেই ঠাকুরবাড়িও বদলে গেল। এখন এখানে আর নিশ্বাস নেওয়া যায় না। অন্তত আমি পারি না। আমার কাছে জোড়াসাঁকোর বাড়ি যেন এক প্রেতপুরী—এখানে আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি, তাই অনেক সময় বুঝতে পারি না। এ-বাড়ির সব আনন্দ, সমারোহ, নিভে গেছে, অন্তত আমার জন্যে। গান-বাজনার যে-আসর এ-বাড়িতে বসত, কত নাটক, কবিতা, গল্পের আসর, সব উধাও। শুনেছি মেজবউঠাকরুণের বাড়িতে এখন সাহিত্যসভা হয়।

যত আলো সেখানে। আমার ঘরে সামান্য বাতিটুকুই আমার সম্বল। মেজবউঠাকরুণের মজলিসে আমায় ডাকে না।

হঠাৎ মনে পড়ছে তোমার মা, আমার শাশুড়িঠাকরুণকে। ভিতরের পাঁচিল ঘেরা ছাদে তিনি বসেছেন সন্ধেবেলায় মাদুর পেতে। তাঁর সঙ্গিনীরা বসেছেন তাঁকে চারদিকে ঘিরে। হালকা হাসিতামাশা আর পরচর্চা। আমার শাশুড়িঠাকরুণের সঙ্গিনীদের কেউ-কেউ ছিলেন পরের বাড়ির খবর সরবরাহে বিশেষ পারদর্শিনী। এঁদের মধ্যে একজনকে ডাকা হত আচার্জিনী নামে। তিনি জনৈক ব্রজ আচার্জির বোন। তিনি যেসব খবর জোগাড় করে আনতেন তার বোধহয় অধিকাংশই শোনা খবর। বা স্রেফ বানানো। কিন্তু শাশুড়িঠাকরুণ বিশেষ পছন্দ করতেন তাঁকেই তাঁর রসালো গল্পের জন্যে। আমার অবিশ্যি প্রবেশাধিকার ছিল না ছাদের সেই বৈঠকে। কিন্তু তুমি এক একদিন ঢুকে পড়তে তোমার বিদ্যেবুদ্ধি জাহির করতে ওই মহিলামহলে।

ঠাকুরপো, তখন তুমি-আমি একই সঙ্গে লেখাপড়া শিখছি। তোমার নতুন শেখা বিদ্যে জাহির করার একটা সহজ জায়গা তোমার মায়ের সঙ্গিনীদের ওই বিকেলবেলার আড্ডাতেই। তোমার টাটকা পুঁথিপড়া বিদ্যে নিয়ে প্রায়ই ছুটে যেতে সেখানে। কখনও এই তথ্য পরিবেশন করে মায়ের সঙ্গিনীদের তাক লাগিয়ে দিতে যে সূর্য পৃথিবী থেকে ন'কোটি মাইল

দূরে। আবার কখনও ঋজুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ থেকে আউড়ে যেতে বাল্মিকী-রামায়ণের টুকরো। তোমার এই বিদ্যেবুদ্ধি জাহিরের ব্যাপারটায় আমি খুব মজা পেতাম।

বাড়ির ভিতরের ছাদটাকে দখল করে নিয়েছিল ঠাকুরবাড়ির মহিলামহল। এই ছাদটা ছিল ঠাকুরবাড়ির ভাঁড়ার ঘরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। মেয়েরা দুপুরবেলা ছাদে যেত অনেক কাজ একসঙ্গে করতে। রোতে শুকোতো এলো চুল। জারক নেবুও জারিয়ে নিত ওই রোদে। পিতলের গামলা-ভরা কলাইবাটা নিয়ে তারা বড়ি দিত ছাদেই।

ওই মেয়েদের ছাদেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম বন্ধুত্ব ঠাকুরপো। তখন তোমার বয়েস সাত। আমি তোমার চেয়ে দু'বছরের বড়। কাঁচা আম ফালি করে কেটে আমসি শুকোনা হত। তোমার নজর ছিল সেই দিকে। তুমি ঘুর-ঘুর করতে রোদ খাওয়া সরষের তেলে মজে-ওঠা ইঁচড়ের আচারের পাত্রগুলির পাশেও। ধরা পড়বার সম্ভাবনা দেখলেই ভান করতে, যেন তোমার ছাদে আসার প্রধান উদ্দেশ্য কাক তাড়িয়ে আমাকে সাহায্য করা।

ঠাকুরপো, আজ তুমি সবই ভুলেছ, ভুলতে পারলাম না আমি। বাড়িতে তুমিই ছিলে আমার একমাত্র দেওর। আমাদের বন্ধুত্বের শুরু আমসত্ত্বের হাত ধরে—নিশ্চয় মনে পড়ে না তোমার। তোমাকে নিযুক্ত করেছিলাম আমি আমার আমসত্ত্বের

পাহারাদার। তখন থেকেই তোমাকে মনে মনে খুব ভালোবসেছিলুম আমি। তোমাকে চাইতাম আমার সব খুচরো কাজের সাথি করে। তুমিও ছিলে এক পা বাড়িয়ে। ইস্কুলে যেতে তুমি একেবারে চাইতে না। কারণটা যে ছিল আমার সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বের টান, সে কি আমি বুঝতাম না ভেবেছ। তুমি ইস্কুল ছুটি হলেই সোজা চলে আসতে আমার ঘরে— সেখানে আমিই তোমাকে শিখিয়েছিলুম জাঁতি দিয়ে সুপুরি কাটতে। খুব সরু করে সুপুরি কাটতে পারতে তুমি। আমি যেই তোমার সুপুরি কাটার প্রশংসা করতাম, অমনি আরও তাড়াতাড়ি আরও সরু করে সুপুরি কাটতে তুমি। আমি মনে মনে বেশ মজা পেতাম।

ঠাকুরপো, এ-বাড়ির বউ হয়ে আসার পর তুমিই আমাকে দিলে মুক্তির প্রথম স্বাদ, চেনালে আমার প্রথম ছুটির দেশ। আমাকে ভোরবেলা একদিন নিয়ে গেলে বাইরের ছাদে।

বলেছিলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অনেক ভোরবেলা যেন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করি তেতলার বাবামশায়ের ঘরের সামনে। তাই করলাম আমি। চুপি চুপি গেলাম সেখানে।

দেখলাম, তুমি সেখানে দাঁড়িয়ে। বললে, আর দেরি করলে দেখতে পেতে না। আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি।

আমি তো অবাক। কাকে দেখব এত সকালবেলা! তুমি আমাকে হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে গেলে বাইরের ছাদে।

চিলেকোঠার আড়ালে দাঁড়িয়ে দূর থেকে দেখলাম, সূর্য উঠছে।

আমার জীবনে সেই প্রথম সূর্যোদয়। তোমার হাত ধরে। আমার জীবনে সেই সূর্য আজ নিভে যাবে। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা বাকি। তুমি কোথায় ঠাকুরপো?

ঠাকুরপো, মনে আছে তোমার, কারণে-অকারণে কত চিঠি লিখতে আমাকে। একই বাড়িতে একই ছাদের তলায় আমি, তবু লিখেছ চিঠি! যে কথা মুখে বলতে না, বলতে চিঠিতে। আমিও যে লিখিনি তোমাকে, তা নয়। তবে তোমার মতন কি লিখতে পারি আমি? তোমার দুঃখ, তোমাকে আমি চিঠির উত্তরে সব সময়ে লিখতাম না বলে। তা ছাড়া, আমার চিঠি হত ছোট—সেটাও ছিল তোমার দুঃখের কারণ। আজ তোমার সেই দুঃখ হয়তো কিছুটা মিটিয়ে দিয়ে গেলাম।

আমার রবি, তুমি যত চিঠি লিখেছ আমাকে, আমি তোমাকে লিখেছি যত চিঠি, সব ছিল আমার কাছে, আমার আলমারির গোপন ড্রয়ারে। যেখানে কারও হাত পৌঁছবার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। তোমার বিয়ের ক'দিন আগে তুমি এলে আমার ঘরে। নির্জন দুপুরে, যেমন আসতে তুমি, আমার সঙ্গে কত সময় কাটিয়েছ তুমি আলস্যের দুপুরবেলায়। সেদিন তোমার চোখ দেখেই বুঝলাম, আজকের দুপুর

অন্যরকম হতে চলেছে। গভীর বেদনাবোধ আর হতাশা ফুটে উঠেছিল তোমার চোখে।

তুমি এসেই আমার হাতে ধরিয়ে দিলে হাতির দাঁতের কাজ করা একটি কাঠের বাক্স। বললে, নতুনবউঠান, এই বাক্সে আছে আমাকে লেখা তোমার সব চিঠি। আজ থেকে তুমিই এদের আশ্রয় দিও। আমার মনে হল, কান্না চেপে কথাগুলি বললে আমাকে। তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলে আমার ঘর থেকে।

সেদিনের পরে আর কখনও চিঠি লেখোনি আমাকে। আমি রোজ ভাবতাম, আজ তোমার চিঠি পাব নিশ্চয়। কিন্তু আর কোনওদিন একটিও চিঠি এল না। হঠাৎ যেন তোমার ভালোবাসা মরুপথে হারাল ধারা। কিংবা বেঁকে গেল অন্য কারও জন্যে অন্য কোনও পথে।

আজ তোমার-আমার সব চিঠি ছড়িয়ে দিয়েছি আমার লেখার টেবিলে। তাদের আমি মুক্তি দিয়ে গেলাম ঠাকুরপো। আমার চিতার আগুনে আমারই সঙ্গে তারাও শেষ হোক—এই আমার শেষ বাসনা।

ঠাকুরপো, একটি চিঠিতে তুমি লিখেছ—চিঠিটা লিখেছিলে বিলেত থেকে ফিরেই—লিখেছ তুমি, 'আমার নতুন বউঠান, দু-বছর পরে বিলেত থেকে ফিরে এসে দেখলেম, যে উনিশ বছরের মেয়েটিকে ফেলে গিয়েছিলেম আর যে একুশ বছরের

মেয়ের কাছে ফিরে এলেম, তারা যেন এক মেয়ে নয়। সত্যি কথা বলবে বউঠান—তুমি কি আমার ফিরে আসার পথ চেয়ে বসে থাকনি?

ফিরে এসে ক্রমশ বুঝতে পারছি ঠাকুরবাড়িতে একুশ বছরের তুমি কত একা! তোমাকে যে আমাদের কর্মচারী শ্যাম গাঙ্গুলির মেয়ে বলে আমাদের বাড়ির মহিলামহলে কত গঞ্জনা শুনতে হয়, সে-কথা বুঝতে পেরেছি আমি। তোমাকে কথা শুনতে হয় তোমার গায়ের রং কালো বলেও। অথচ তোমার ওই লাবণ্যময় শ্যামলবর্ণ আমার কত আদরের তা তো তুমি জানো। তুমি নিঃসন্তান বলেও তোমাকে খোঁটা দিতে সবাই সুযোগ খোঁজে। নতুনবউঠান, যতই দেখছি এ-বাড়িতে তোমার প্রত্যহের কষ্ট, ততই যেন আরও বেশি ভালোবাসছি তোমাকে। তোমার প্রতি আমার এই ভালোবাসা ঠাকুরবাড়ির হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদও বলতে পারো।

এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমি বিলেত থেকে ফিরে আসতেই আমাদের দু'জনের জীবনে যেন উজান এসেছে। আমার উনিশ আর তোমার একুশ ভেসে যাচ্ছে সেই উজানে,—বন্ধনহীনগ্রন্থিতে আমরা বাঁধা পড়েছি দু'জন দু'জনের সঙ্গে, কোনও বাধা নেই কোথাও। এই যে যৌবনের আরম্ভেই বাংলাদেশে ফিরে এসেছি—এ ঘটনা ঘটেছে তোমার-আমার

ভাগ্যের টানে। অন্যরকম কিছুতেই হতে পারত না। ফিরে এসেই তোমাকে পেলাম—অন্য তুমি। পেয়েছি সেই ছাদ, সেই চাঁদ, সেই নিজের মনের বিজন স্বপ্ন, সেই ধীরে-ধীরে ক্রমে-ক্রমে চারদিক থেকে ঘনিয়ে ওঠা, প্রসারিত সহস্র বন্ধন! নতুনবউঠান—এ তোমার বন্ধন। মুক্তি চাইনে আমি। কোনওদিন চাইব না। আমি বিলেত থেকে ফিরে অব্দি তোমার নাগপাশে জড়িত বেষ্টিত হয়ে চুপ করে বসে আছি। আমার খুব ভালো লাগছে নতুনবউঠান।'

ঠাকুরপো, এই তো আর একটা চিঠি। সারা চিঠিতে শুধু দুষ্টুমি। সত্যিই তুমি এত ভালোবাসতে আমাকে? লিখেছ 'নতুনবউঠান, এত ছলচাতুরি, প্রেমের এতরকমের খেলা তুমি শিখলে কোথায় বলোতো? সেদিন সবাই আমরা বসেছি খেতে। জ্যোতিদাদা, আমি, সেজদাদা। মেজবউঠাকরুণ আর তুমি করছ পরিবেশন। কী যে সুন্দর দেখাচ্ছে তোমার লালপাড় ডুরে শাড়িতে। তুমি আমার কাছাকাছি এসেই তুললে তোমার কনক কাঁকনের তরঙ্গ। কত ছলভরে যে বাজাতে পারো তুমি তোমার সোনার চুড়ির গোছা। কে কি বুঝল জানি না, আমি বুঝলাম, এই কঙ্কনঝংকার আমার জন্যে। আর তখুনি আমার মনে হল, তুমি শ্রীরাধা। মুহূর্তে

আমার চোখের সামনে বদলে গেল দৃশ্য। দেখলাম তুমি যমুনার জলে কনককলসে জল ভরছ আর ইচ্ছে করে আমারই জন্যে কত ছলভরে বাজাচ্ছ তোমার কাঁকনগুচ্ছ। আমার মন যেন যমুনার জল নতুনবউঠান। সেই জলে নেমেছ তুমি। তোমার দিকে তাকিয়ে, তোমার চুড়ির শব্দ শুনে, আমার মন বলে উঠল, কেন বাজাও কাঁকন কত ছলভরে। তুমি যেন আমার মনের কথা বুঝলে। আমার পাতে পরিবেশন শেষ করে তুমি এগিয়ে গেলে বটে মেজদাদার দিকে, চকিত নয়নে আমার দিকে তাকানো তোমার ফুরল না। আমার মন যেন জল। তুমি পায়ে-পায়ে এগিয়ে যাও। অথচ আমার মনে হয় তুমি সাঁতার কাটছ আমার মনের স্রোতে। জলে ঢেউ তুলে তুলে খেলা করছ। এক সময়ে খাওয়াদাওয়া শেষ হল। আমি ফিরে এলাম আমার ঘরে। তবু সেই যে ঢেউ তুললে তুমি আমার মনে, সেই সব হাসিভরা ঢেউ কলস্বরে কানাকানি করতেই থাকল মনের মধ্যে। জানলা দিয়ে দেখলাম আকাশে ক্রমে জমছে মেঘমালা। মনে হল, সেই মেঘ বাগানকিনারে তোমারই মুখপানে তাকিয়ে। নতুনবউঠান, হঠাৎ তোমার উদ্দেশ্যে মনের মধ্যে ভেসে উঠল দুটি সহজ সরল লাইন—

প্রকাশ করি কিসের ছলে মনের কথা
তোমার রঙিন পাতায় লিখব প্রাণের কোন বারতা।

*

নতুনবউঠান, এ-দুটি লাইন মনে এসে টেনে আনল আরও দুটি লাইন। লিখে রাখলাম আমার খাতায় ঃ

বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ বলা—নাই যে আমার ছলাকলা, কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা।'

প্রাণের ঠাকুরপো, তোমার একটি চিঠি মাত্র কয়েক লাইনের। কিন্তু কী যে লজ্জা পেয়েছিলাম চিঠিটা পড়ে। আবার ভালোও লেগেছিল—আমার বুকের মধ্যে সারাবেলা রেখে দিয়েছিলাম চিঠিটা। এই সেই চিঠি—আমার সঙ্গে চিতায় পুড়বে। তুমি লিখেছ, 'তব ওষ্ঠ দশনদংশনে টুটে যাক পূর্ণফলগুলি।' তুমি যখন দুষ্টুমি করো ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে পেরে উঠবে কে? তুমি যে ভাষার জাদুকর—এই একটা লাইনে তুমি কি না বললে! আজ জীবনের শেষ দিনে আরও একবার বুকের মধ্যে রেখে দিতে ইচ্ছে করছে তোমার এই একটি লাইন—এত মায়া কী করে ছেড়ে যাই ঠাকুরপো?

রবি, আর একটি চিঠিতে তুমি লিখেছ এমন কয়েকটি লাইন যা হয়তো বাঁচিয়ে রাখাই উচিত—ভবিষ্যতে যার মূল্য হতে পারে অপরিসীম। তবু সেটাকেও পুড়িয়ে দিও—কারণ সেই চিঠিতেও যে প্রকাশ পেয়েছে তোমার অবৈধ প্রেম :

'নতুনবউঠান, তুমি শুনতে ভালোবাস প্রতাপাদিত্যের গল্প।

আজকাল প্রায়ই দুপুরবেলা তোমার একলা ঘরে তোমার পাশে শুয়ে শুয়ে পড়ে শোনাই প্রতাপচন্দ্র ঘোষের বঙ্গাধিপ পরাজয়ের কাহিনি। তোমাকে জানাই, তোমাকেই গল্প শোনাতে শোনাতে আর তোমার হাত পাখার বাতাস খেতে খেতে আমার মনের মধ্যে নিঃশব্দে রচিত হল, 'বউঠাকুরানির হাট'। ঠাকুরপো, যাঁরা তোমার 'বউঠাকুরানির হাট' পড়ে মুগ্ধ হবেন, বা ভাববেন কত না কথা, তাঁরা কি জানবেন কোনওদিন এই কথা যে দুপুরবেলা আমার পাশে শুয়ে-শুয়ে আমার হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে তুমি প্রথম ভেবেছিলে এই উপন্যাসের গল্প? তুমি যা আমাকে বলেছ তা আমারই থাক, আমার সঙ্গে পুড়ে যাক তোমার ভালোবাসার এই স্বীকারোক্তি।

অনেক আদরের ঠাকুরপো, তোমার বেশিরভাগই চিঠিই বেশ ছোট। আমার মন খারাপ হয়ে যেত চিঠি খুব ছোট হলে। কিন্তু ক্রমে বুঝতে পারলাম, দু-একটি কথায় তুমি এত কথা বলতে পারো যে তোমার বেশি লেখার দরকার হয় না। তা ছাড়া, ছোট চিঠি লুকিয়ে রাখাও সহজ। হয়তো সেকথা ভেবেও তুমি চিঠির বহর ছোট রাখতে। তবে চিঠি তোমার যতই ছোট হোক ঠাকুরপো, আমার কাছে তোমার কোনও চিঠি পড়াই শেষ হয়নি—আজও। কতবার পড়েছি এইসব চিঠি। তবু বারবার পড়তে ইচ্ছে হয়। যেমন এই চিঠিটা, লিখেছ, 'নতুনবউঠান, আবার চলে যেতে হবে

তোমাকে ছেড়ে? আবার বিচ্ছেদ? আবার তোমার-আমার মনকেমনের কষ্ট? নতুনবউঠান, আজ সন্ধেবেলায় যখন আমরা দু'জনে দাঁড়ালাম দক্ষিণের ছাদের নিঃসঙ্গ কিনারে, মনে হল ধূসর দিনের দিকে তাকিয়ে, যেন দাঁড়িয়ে আছি সাগরের তীরে তোমারই পাশে। অনেক দূরে, সাগরের ওপারে, মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার এক দেশ, যেখানে যেতে হবে তোমাকে ছেড়ে। আমার মন হঠাৎ কথা বলে উঠল কবিতায় —দিবস ফুরাবে যবে, সে দেশে যাইতে হবে। এপারে ফেলিয়া যাব আমার তপন শশী। নতুনবউঠান, তুমি আমার তপন শশী, তুমিই আমার জীবনের ধ্রুবতারা, তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও কোনওদিন যাব না। যেতে পারব না।' ঠাকুরপো, এসব কথা যখন লিখেছিলে তখন তুমিও কি জানতে অক্ষরে-অক্ষরে বাসা বেঁধে আছে কত বড় মিথ্যে!

আমার প্রাণের রবি, কত কথা মনের মধ্যে জেগে উঠেই হারিয়ে যাচ্ছে, তলিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে চিরকালের মতো— কোনওদিন আর ফিরে আসবে না তারা। মনে পড়ছে, সেদিন ছিল ৫ই জুলাই। আমার জন্মদিন। আবার বিয়ের দিনও। তোমার জ্যোতিদাদাকে বলেছিলাম, যেন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরেন। তিনি সেদিন বাড়িই ফিরলেন না। জানি না তিনি সারারাত কোথায় ছিলেন। মেজবউঠাকরুণের কাছে না থিয়েটারের মজলিসে। অনেক রাত হয়ে গেল। বুকের মধ্যে

কী যে আগুন জ্বলছিল—সেই রাতেই আমি চিতায় পুড়েছি ঠাকুরপো। আমার মরণ হয়েছে সেই রাতেই। এমন সময়ে তুমি ঢুকলে ঘরে। আমি বললাম, এত রাতে কোথা থেকে? তুমি বললে, আজ তোমার জন্মদিন। সবাই ভুলেছে। আমি ভুলিনি নতুনবউঠান। আমার তখন সব জ্বলছে। ঝলসে গেছে সব শরীর মন। ঠাকুরপো, তুমি কাছে এসে দাঁড়ালে। আমার বুকের আঁচল জ্বলছে, জ্বলছে-পুড়ছে আমার চোখ, যে চোখ তুমি এত ভালোবাস, আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অন্ধকার ঘরে জ্বলছি আর পুড়ে ছাই হচ্ছি—তুমি জড়িয়ে ধরলে আমার জ্বলন্ত শরীরটাকে।

ঠাকুরপো, আমি জানতাম না আমার শরীরে এখনও এত আগুন ছিল। তুমিও কি ভাবতে পেরেছিলে? তুমি হয়তো না জেনেই তোমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেছিলে সেই আগুন। আমার আগুন ঠাকুরপো ছড়িয়ে পড়ল তোমার সারা শরীরে। তুমিও গেলে ঝলসে। আমার আদরে ছিল সেদিন শুকনো কান্না। আমার শরীরে চিতার শিখা। তুমি আঁকড়ে ধরেছিলে সেই অন্ধকার দহন।

ঠাকুরপো, অমন আদর এ-জীবনে আর পাইনি। তুমি আদর করছ আমাকে, আর আমার জ্বলন্ত ইচ্ছে ক্রমাগত বেরিয়ে আসতে চাইছে বহ্নিমান আবরণের যন্ত্রণা থেকে। মনে হল আমার কানের লতিতে হঠাৎ যেন ছোবল মারল

আগুনের দংশন, একটিই শব্দ বেরিয়ে এল তখন—ঠাকুরপো! কতক্ষণ আমার জ্বলন্ত শরীরটা তুমি আঁকড়ে ছিলে—কতক্ষণ আমার সঙ্গে সে-রাত্রে তুমিও পুড়েছিলে—আমি কিচ্ছু জানি না। তোমরা বুকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল তখন পুবের আকাশে সবে দেখা দিয়েছে আলো। দেখলাম একাই শুয়ে আছি। আমার বুকের ওপর তুমি রেখে গেছ তোমার দু-লাইনের এই চিঠি ঃ

'মেঘের দুঃস্বপ্নে মগ্ন দিনের মতন
কাঁদিয়া কাটিবে কিরে সারাটি যৌবন।'

কয়েকদিনের মধ্যে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম। সেই আমার প্রথম চেষ্টা। কিন্তু মরলাম না। তুমি লিখলে, 'জ্যোর্তিময় তীর হতে আঁধার সাগরে/ঝাঁপায়ে পড়িল এক তারা/একেবারে উন্মাদের পারা!'

আমার ঠাকুরপো, ক্রমে বেলা বাড়ছে। আজ খিদেতেষ্টা সব ভুলেছি। প্রায় দেখতে পাচ্ছি পথের শেষ। এত যন্ত্রণার অবসান আর খুব দূরে নয়। তবু এখনই মনে হচ্ছে, যদি তুমি আমারই থাকতে ঠাকুরপো, যেমন ছিলে তুমি, তাহলে এখনও আমি থাকতে পারতাম পৃথিবীতে, আমার সব বেদনা ও অপমান মেনে নিয়েও। তুমি থাকলে জীবন এমন নিঃস্ব হতে যেত না।

এই দেখো! পেয়েছি সেই চিঠিটা। এ-চিঠিটা বেশ দীর্ঘ।

চিঠিটা যখন প্রথম পড়ি, সত্যি কথা বলছি, ভালো লাগেনি আমার। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হয়েছিল। আর তোমাকেই যেন দূরে সরিয়ে দিয়েছিল মন! কিন্তু তোমার এই চিঠিটা কোনওদিন আমার কাছে ফুরিয়ে গেল না। বারবার আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তে ফিরে-ফিরে এসেছে এই চিঠি আমার জীবনে! যতবার পড়েছি চিঠিটা, ততবারই খুঁজে পেয়েছি নতুন অর্থ—প্রতিটি শব্দ নতুনভাবে আদর করেছে আমাকে।

আমার যে একটা শরীর আছে ঠাকুরপো মাঝেমাঝে সত্যি ভুলে যাই—এই শরীরটা এবার পুড়বে, শরীরের সব চিহ্ন, সমস্ত ইচ্ছে আগুনে ছাই হবে। আজ শরীরটাকে ছেড়ে যাওয়ার আগে আরও একবার পড়তে ইচ্ছে করছে চিঠিটা। এ-চিঠির অক্ষরে-অক্ষরে আমার দেহ তোমার চোখে হয়ে উঠেছে উৎসব—সারা চিঠিটা যেন আমার রূপের মধ্যে যে-আর্দ্রতার দেখা পেয়েছিলে তুমি, তারই উদযাপন। তোমার-আমার তৈরি নন্দনকাননের মতো আজ আমার দেহটাও শীর্ণ, জীর্ণ, শুকনো। নন্দনকাননে শুধুই এখন শুকনো পাতার ভিড়, একটিও ফুল নেই। আমার শরীরের কোনওকালে যে ফুল ফুটেছিল। তার চিহ্নমাত্র নেই। অথচ তুমিই একদিন আমাকে ডেকেছিলে 'সরোবরময়ী' বলে। বলেছিলে আমি শ্রীরাধার মতো আর্দ্র মেয়ে। আমার দেহ তোমার চোখে বৃষ্টি ভেজা বাগানের মতো। এই তো তুমি লিখেছ :

'আমার অনেক আদরের নতুনবউঠান, আজ বড্ড গরম পড়েছে। আকাশে মেঘ নেই। ভুবনে বৃষ্টি নেই। তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে। হঠাৎ দেখলাম তোমাকে, বিকেলবেলা সদ্য গা-ধোয়া তুমি, নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে নন্দনকাননের দোলায় গিয়ে বসলে, তোমার গ্রীবাটি এখনও ভিজে-ভিজে। তোমার গ্রীবায় জলভেজা চুলগুলি চিকচিক করে লোভ দেখাল আমাকে। তোমার সদ্যস্নাত শরীরের ভিজেভাবটি ছড়িয়ে পড়েছে তোমার শাড়ির শরীরেও। আমার মনে এল চণ্ডীদাসের কাব্যে 'গলিতবসন' শব্দটি। আর তখুনি মনে হল, নতুনবউঠান, তুমিই যেন শ্রীরাধা। তোমার আঁচলটির প্রতি উদাসীন। এক আর্দ্র আলস্যের মধ্যে যেন ডুবে আছ তুমি। শ্রীরাধার ভিজে বসনকে চণ্ডীদাস বর্ণনা করেছেন একটি শব্দে—'রসনাহীন'। অর্থাৎ মেখলাবন্ধনমুক্ত। তোমার আঁচলটিও তেমনি যেন 'রসনাহীন'। দক্ষিণের বারান্দার কোণ থেকে আমি তাকিয়েছিলাম তোমার দিকে। চণ্ডীদাস যেমন দেখেছেন রাধাকে, ঠিক তেমনি দেখলাম আমি তোমাকে। 'লাবণ্য জল তোর সিহাল কুন্তল/বদন কমল শোভে অলক ভষল।' তোমার দিকে তাকিয়েও আমার মনে হল, যদিও আকাশে মেঘ নেই, ভুবন জলহীন রুক্ষ, তবু তোমার শরীর যেন সরোবর, তোমার মুখটি সেই শরীরসরোবরে পদ্মের মতো বিরাজমান। তোমার মুখের ওপর উড়ু উড়ু চুল খেলা করছে,

যেন ভ্রমর। নতুনবউঠান, তোমার হাসি আর তোমার চোখ, আমি কোনওদিন ভুলতে পারব না। তোমাকে একটু আগেই তো দেখলাম নন্দনকানন্দের দোলনায়, আকাশ পানে তাকিয়ে। চণ্ডীদাসের মতো আমারও মনে হল, সরোবর-বউঠানের দুটি চোখে দুটি নীলকমল ভাসছে। আর বিকেলবেলার আলোয় তোমার ওই সদ্যধৌত দুটি গাল কেমন লাগল আমার জানো? চণ্ডীদাসকে দিয়ে বলিয়ে নিই আমার মনের কথা—নতুনবউঠান, তোমার দুটি গাল নেশা ধরানো ভিজেভিজে মহুয়া ফুল। সুন্দরী নতুনবউঠান, তুমি সরোবরময়ী।

এবার শোনো, খুব মন দিয়ে শোনো, কেন তোমাকে বললাম সরোবরময়ী। রাধার ঠোঁট দুটিকে বৈষ্ণবকাব্যে বলা হয়েছে, যেন পদ্মের ভেজা পাপড়ি। আমিও যদিও তোমার ঠোঁট দুটিকে তাই বলি—নতুনবউঠান, খুব রাগ করবে আমার ওপর? আর যদি বলি, তোমার হাসি যেন সিক্ত পদ্ম। তোমাকে বরং বলি বৈষ্ণপদাবলীর রাধা কতদূর ভিজে মেয়ে—রাধার অধর যেন সদ্যফোটা ভিজে বাঁধুলি ফুল—ফুটিল বন্দুলী ফুল বেকত অধর। রাধার বাহু যেন সিক্ত মৃণাল। রাধার করতল—যেন আর্দ্র রক্তপদ্ম। তোমার করতল আমার করতলে যখনই ধরা দিয়েছে, আমারও মনে হয়েছে একই কথা। রাধার অপরূপ স্তন দুটি যেন শরীর সরোবরে সাঁতারু হাঁস। রাধার ভিজে কোমরের তিনটি ভাঁজ, ত্রিবলি,

যেন সরোবর-ঘাটের তিনটি সিক্ত সোপান। রাধার নধর নিতম্ব যেন সরোবর ঘাটের পিছল শিলা। নতুনবউঠান, এই ভেজা রাধার জন্যেই শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জীর্ণ। পুরুষ যুগে-যুগে চেয়েছে এমন নারী, তাকে না পাওয়ার জন্যে কষ্টও পেয়েছে। বৈষ্ণবকাব্যে রাধার নামের নারীটি সদা 'তরল'। নতুনবউঠান, সংস্কৃত ভাষায় 'তরল' শব্দটি 'চপল' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। রাধার শরীর কি শুধুই 'তরল'। সেই তরলতা রাধার শরীর ও স্বভাবের চাপল্যকেও যে বোঝাচ্ছে!

রাধার গভীর নাভিতে দুলছে নাগকেশর ফুল। সেই অনন্যার জঙ্ঘায় ফুটছে স্বর্ণকেতকী। তার তেলতেলে ভিজে কাপড় যেন তিসির তৈরি। কী আশ্চর্য তুলনা—যার গভীর প্রসারী ব্যঞ্জনা এই বার্তাটুকু পৌঁছে দেয় যে, জল আর তেল যেমন এক হয় না, তেমনি একসঙ্গে থাকে না রাধার শরীর ও বসন। রাধার 'তরল' অর্থাৎ চপল ও আর্দ্র শরীর থেকে ক্রমাগত খসে যাচ্ছে আবরণ।

নতুনবউঠান, আমি জানি তুমি বলবে, বৈষ্ণব কবিরা গভীর রাত্রে ঝড়ের সময়ে রাধিকার অকাতর অভিসার সম্বন্ধে অনেক ভালো মিষ্টি কবিতা লিখেছেন, কিন্তু একটা কথা ভাবেননি, এরকম ঝড়ে তিনি কৃষ্ণের কাছে কী মূর্তি নিয়ে উপস্থিত হতেন। তাঁর চুলগুলোর অবস্থা যে কীরকম হত! কেশবিন্যাসেরই কীরকম দশা? ধুলোতে লিপ্ত হয়ে, তার

ওপর বৃষ্টির জলে কাদা জমিয়ে, কুঞ্জবনে কীরকম অপরূপ মূর্তি করে গিয়েই দাঁড়াতেন!

আদরের বউঠান, তোমার যুক্তির এবং বক্তব্যের সারবত্তায় আমি এতটুকু সন্দেহ প্রকাশ করছি না। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা তো প্রেমের নারীরূপ। সেই চিরন্তন রমণী শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে কদম্ববনের ছায়া দিয়ে যমুনার তীরপথে প্রেমের আকর্ষণে ঝরবৃষ্টির মাঝে আত্মবিহ্বল হয়ে স্বপ্নগতার মতো চলেছেন, পাছে শোনা যায় বলে পায়ের নূপুর খুলে রেখেছেন, পাছে দেখা যায় বলে রাতের অন্ধকারে পরেছেন নীলাম্বরী কাপড়, কিন্তু পাছে ভিজে যান বলে ছাতা নেননি। পাছে পড়ে যান বলে বাতি আনা আবশ্যক বোধ করেননি। নতুনবউঠান, প্রেম তো এই রকমই।

আদরের বউঠান, একথা তোমাকে কতবার বলেছি, আবার বলছি, বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসার-ভাবনায় বৃষ্টি, জল, রতিসুখ, শৃঙ্গার সব অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে। তাদের পৃথক করা যায় না। আমি অন্তত পারি না। তোমার বুকে যে হারটি দুলছে, সেটিও রাধার হারের মতো—'তরলিত'। সেখান থেকে রাধাই ঝরে পড়ছে বিন্দু-বিন্দু। জয়দেব লিখছেন, রাধার হার থেকে ঝরে পড়ে তার রতিশ্রমের ঘাম ঃ

শ্রমজলকণভরসুভগশরীরা।
পরিপতিতোরশি রতিরণধীরা।

*

নতুনবউঠান, একদিন দুপুরে তোমার ওই ভিজে হারটি আমার গলায় পরিয়ে দিয়েছিলে। আজ তোমাকে বলি—তোমার মধ্যে আমি পেয়েছি বৈষ্ণবকাব্যের রাধাকে। সেই তারল্য। সেই চাপল্য। সেই হাসি। সেই চোখ।

একদিন চণ্ডীদাসের রাধা বৃষ্টির মধ্যে কৃষ্ণকে বলল, কানাই, তোমার এই নৌকাটিকে যমুনার জলে ডুবিয়ে দাও। আর পাছে যমুনার জলে আমি ভিজে যাই, তুমি আমাকে কোলে করে যমুনা পার হও।

নতুনবউঠান, রাধা বলতে আমি যা কিছু ভাবতে পারি, তুমি তার সবটুকু। নৌকা ডুবিয়ে আমি কবে পাগলের মতো নেমে পড়েছি যমুনার জলে—তোমারই জন্যে নতুনবউঠান!'

ঠাকুরপো, তুমি একদিন এ-চিঠি লিখেছিলে আমাকে! আর আজ তোমার কবিতায় আমার আদরের, আমার শরীরের, তোমার-আমার কোনও নির্জন স্মৃতির চিহ্নমাত্র নেই। আজ আমি পুরাতন। আজ আমাকে জায়গা ছেড়ে দিতে হবে তোমার জীবনে নতুন খেলার জন্যে। আজ আমার সামনে শুধুই অন্ধকার। তবে তাই হোক ঠাকুরপো, জ্বলুক-পুড়ুক আমার শরীর। তারই সঙ্গে জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক তোমার এই চিঠিটিও।

আদরের ঠাকুরপো, আবার আমার জীবনের শেষ প্রহরের ছন্নছাড়া মন পথ হারিয়ে চলে এল নতুন এক মনকেমনে। তখন তুমি ছিলে অন্য মানুষ। আমার প্রাণের মানুষ তো। শুধু আমারই ছিলে তখন। তোমার দ্বিতীয়বার বিলেত যাওয়ার কথা উঠতেই একা থাকার যন্ত্রণার ভয়ে আমি চেষ্টা করলাম আত্মহত্যার। মরলাম না। কিন্তু তৈরি হল আমার নতুন বদনাম। নতুন লজ্জা। আমার পক্ষে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ অসহনীয় হয়ে উঠল। আমি তোমার নতুনদাদাকে নিয়ে চলে এলাম চন্দননগরে। সেখানে ভাড়া করা হল নীল ব্যবসায়ী মোরান সাহেবের বিরাট কুঠিবাড়ি। সেখানেই উঠলাম আমরা দু'জনে—বুঝলাম দু'জনেও একা হওয়া যায়। তোমার নতুনদাদা থাকেন তাঁর নিজের জগতে। আর আমি তোমার জন্যে সারাক্ষণ দুঃসহ মনকেমন নিয়ে, আমার নিজস্ব বেদনা ও অপমানবোধ নিয়ে, নির্বাসিত থাকলাম আমার জগতে। তোমার জাহাজ চলল তোমাকে নিয়ে মাদ্রাজে, সেখান থেকে শুরু হবে তোমার দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা।

কিন্তু বিলেত গেলে না তুমি! মাদ্রাজে জাহাজ থেকে নেমে চলে এলে আমার কাছে। ঠাকুরপো, তুমি এলে, আমার শরীর-মনে জোয়ার এল। মনে হল, পৃথিবীটা কী সুন্দর। আমার হৃদয়বাড়ি ফিরল নির্বাসন থেকে।

কিন্তু কেন তুমি বিলেত গেলে না ঠাকুরপো? পাছে

ঠাকুরবাড়ির মহিলামহলের বিষাক্ত পরিবেশে একাকিত্বের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে আমি আবার আত্মহত্যার চেষ্টা করি—তাই তো? তুমি ফিরে এলে আমার আশ্রয় হয়ে! কিন্তু বাঁচাতে কি পারলে আমাকে? আমার প্রেমই আমার নিয়তি—তুমি বাঁচাবে কীভাবে!

ঠাকুরপো, যদি বলি বিলেতের পথ থেকে তোমার এই ফিরে আসার মধ্যেই নিহিত ছিল আমার মরণের বীজ—সহ্য করতে পারবে? না না, আমি চলে যাওয়ার পরে কোনওরকম অপরাধবোধে ভুগে কষ্ট পেয় না তুমি। কষ্ট দিও না তোমার একরত্তি নতুন বউটিকে। এ-আমার ভাগ্য—তোমার তো কিছু করার নেই। তোমার ভালোবাসাই তো তোমাকে টেনে এনেছিল আমার কাছে। বাকিটুকু তো তোমার-আমার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ছিল না।

ঠাকুরপো, তোমার অনেক আগে আমার প্রেমে পড়লেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী। তিনি তোমার নতুনদাদার বন্ধু। তাঁর সূত্রেই বিহারীলাল আসেন এ-বাড়িতে। বন্ধুত্ব হল আমার সঙ্গেও। আমি ছিলাম তাঁর গুণমুগ্ধ পাঠিকা, শ্রোতা। তিনি শুধু তাঁর নতুন লেখা আমাকে শোনাতেই ভালোবাসতেন না, ভালোবাসতেন আমার হাতের রান্না খেতে।

একদিন আমাকে বললেন, 'তোমার হাতের স্পর্শ আছে বলেই তোমার হাতের রান্না এত ভালো।'

কথাটা আমার মধ্যে ঠাকুরপো তৈরি করল নতুন তরঙ্গ। এমন কথা এ-বাড়িতে কারও মুখে আগে কখনও শুনিনি। তোমার নতুনদাদার জন্যে তো আমি কত নতুন-নতুন রান্না করি। তিনি সেই রান্না খেয়ে কোনওদিন আমাকে আমার আঙুলের স্পর্শের উল্লেখ করেননি। এই দেখো, বিহারীলালের কথা বলতে গিয়ে একটু বাড়াবাড়িই করে ফেললাম আমি—তোমার কথাটা ভুলেই গেলাম। ঠাকুরপো, তুমি তো কতবার আমাকে বলেছ, আমি যেদিন সামান্য লঙ্কা দিয়ে তোমার জন্যে মেখে দিই পানতাভাত সেদিন আর কথা থাকে না! সে তো আমার অঙ্গুলিস্পর্শের গৌরব ঠাকুরপো, তাই না?

একদিন বিকেলবেলা বিহারীলাল এলেন যেন আমার সঙ্গেই কথা বলতে। তখনও তোমার নতুনদাদা কাছাড়িবাড়িতে, নীচের তলায়। আমি ছিলাম নির্জন।

বিহারীলাল বললেন, 'তুমিই আমার সারদামঙ্গল' কাব্যের সরস্বতী। তিনটি প্রেরণার স্রোত এসে মিশেছে আমার সারদামঙ্গলে। তিনটি স্রোতই হল বিরহের স্রোত—মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ। তুমিই বসে আছ এই তিন বিরহস্রোতের কেন্দ্রে।' ঠাকুরপো, বিহারীলালের কথাটা যে খুব ভালো বুঝতে পারলাম, তা নয়! কিন্তু বুকের মধ্যে কেমন একটা করতে লাগল। দেখলাম, বিহারীলালের চোখ আবেগে

ছলছল করছে। বুঝলাম আমাকে ভালোবেসে উনি কষ্ট পাচ্ছেন। ওঁর জন্যে কষ্ট হল। আবার ভালোও লাগল ঠাকুরপো। আমাকে ভালোবেসে আমার বিরহে কেউ কষ্ট পেতে পারেন! বিহারীলালের কথায় কেন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম।

সেই সময়ে আমি একটা আসন বুনছিলাম। কার্পেটের আসন। যখনই একলা লাগত, কাজ নেই হাতে, সময় কাটাবার উপায় ছিল ওই আসনটির কাছে ফিরে যাওয়া। মনে মনে চাইতাম, এই আসনবোনার কাজটি যেন কোনওদিন না শেষ হয়। তোমার নতুনদাদা ঘরে আসেন-যান, দেখেন খাটের এক কোণে বসে আমি আসন বুনি, কোনওদিন জিগ্যেস পর্যন্ত করেননি কার জন্যে এই আসন। আসনবোনার কাজটির মধ্যেও যে মিশে যেতে পারে মন, ভালোবাসা,—এসব কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি হয়তো কখনই।

সেদিন বিহারীলালের কথা শোনবার পরেই কী যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল মনের মধ্যে! যে-মানুষটির মধ্যে তৈরি হয়েছে আমার করস্পর্শের জন্যে এমন আকুল আকাঙক্ষা, তাঁকে এমন কিছু একটা উপহার দিতে আমার মন চাইল, যার মধ্যে চিরদিন থেকে যাবে আমার মন, আমার ভালোবাসা, আমার হাতের ছোঁয়া। দৌড়ে আমার ঘরে এসে ওই আসনটির কোণে বুনতে শুরু করলাম বিহারীলালের নাম। ক'দিন পরে আসনটি

তুলে দিলাম আমার প্রিয় কবির হাতে—সেইদিন আমি প্রথম 'অসতী' হলাম ঠাকুরপো, কারণ ওই আসনটিই ছিল বিরাহীলালের প্রতি আমার প্রেমপত্র।

আসনটি উনি দু'হাতে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন আমার পানে। আমি লজ্জায় ওঁর চোখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। আমার মধ্যে যে একেবারেই কোনও অন্যায়বোধ ছিল না, তাও নয় ঠাকুরপো। কিন্তু সেই পাপবোধ, অন্যায়বোধ ছাপিয়ে উঠেছিল আমার এত বছর ধরে চেপে রাখা অভিমান—ছাপিয়ে উঠেছিল আমার ভালোবাসা। সেদিন থেকে আমার প্রতি বিহারীলালের ব্যবহারও গেল বদলে। তিনি চোখ তুলে তাকাতেই পারতেন না আমার দিকে। ক্রমে আমাদের বাড়িতে আসাও কমিয়ে দিলেন। তবে, যখনই লিখতেন কোনও নতুন কবিতা, চলে আসতেন আমাদের সাহিত্যসভায়। অনেকেই থাকতেন সেই মজলিসে। অবশ্যই থাকতেন তোমার নতুনদাদা। থাকতেন মেজবউঠাকরুণ। কিন্তু আমার মনে হত, হয়তো আরও অনেকেরই মনে হয়েছে একই কথা—বিহারীলাল শুধু আমারই জন্যে লেখেন তাঁর প্রেমের কবিতা। শুধু আমাকেই শোনান। সভায় উপস্থিত বাকিদের কথা তাঁর বোধহয় মনেই থাকে না।

তুমি তখন বিলেতে। ক্রমে আমার মধ্যে তৈরি হল এক

গভীর অভাববোধ—কীসের অভাব, সবই তো আছে, তবু অভাববোধ, বিষণ্ণতা, মনকেমন। ঠাকুরপো, মনকেমন তোমার জন্যে। তোমার চিঠি আসে বিলেত থেকে। আসে তোমার কবিতা। আমার মন, আমি বুঝতে পারি, ধীরে-ধীরে সরে যাচ্ছে বিহারীলালের জগত থেকে তোমার জগতে। কেন এমন হচ্ছে, তাও বুঝতে পারি আমি। এক সময়ে তোমাকে বলতাম, ঠাকুরপো, তুমি কোনওদিন বিহারীলালের মতন লিখতে পারবে না। শুনে তুমি যত না দুঃখ পেতে তার চেয়ে অনেক বেশি বেড়ে যেত আরও ভালো লেখার ঝোঁক—বিহারীলালের মতো লেখা নয়। তাঁর প্রভাবমুক্ত অন্য রকম, আরও ভালো লেখা। আমি তখুনি বুঝতে পেরেছিলাম, তোমার প্রতিভা জাতেগোত্রে আলাদা। কিন্তু জানতে দিইনি তোমাকে—জানতে দিয়ে পাছে তোমার মাথা খেয়ে বসি।

তোমার বিলেত থেকে আসা চিঠিগুলিই আমাকে প্রথম বুঝিয়ে দিল, বিহারীলালের জগতের অনেক দূরে, অনেক বাইরে পা ফেলেছ তুমি—বুঝতে পারলাম ঠাকুরপো, তুমি অনেক দূরের যাত্রী, তোমার এ-যাত্রা থামার নয়, যতই তুমি এগোবে, ততই পিছিয়ে যাবে তোমার সামনে দিগন্তরেখা। বুঝতে পারলাম, তুমি অনন্তের পথিক। ঠাকুরপো, জোড়াসাঁকোর বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যে এক বিপন্ন বন্দিনী আমি। তবু পাড়ি দিতে চেয়েছিলাম তোমার সঙ্গে। হতে চেয়েছিলাম

তোমার সহযাত্রিণী। কখন আসবে বিদেশ থেকে তোমার চিঠি, শত বাঁধা ডিঙিয়ে অবশেষে পৌঁছবে আমার হাতে—তোমার প্রবাসের পত্রের জন্যে সারাক্ষণ অপেক্ষা করত মন।

তোমার কোনও কোনও চিঠি যত ভালো লাগত, ততটাই—না, তার চেয়েও বেশি—কষ্টও দিত আমাকে। আজ মনে হচ্ছে, তুমি আমাকে কষ্ট দেওয়ার জন্যেও লিখতে। বিহারীলাল কখনও আমাকে এইভাবে কষ্ট দিতে পারতেন না। তিনি আমাকে ছাড়া আর কোনও নারীর কথা ভেবেছেন বলেই তো মনে হয় না আমার। প্রেমের ব্যাপারে তিনি নিতান্ত সেকেলে। তুমি ঠাকুরপো ততটাই আধুনিক। ভালোবাসার মেয়েটিকে তোমার জীবনে অন্য নারীসঙ্গের কথা বলে তার মধ্যে ঈর্ষা জাগিয়ে তুমি আধুনিকতার আনন্দ পাও—এ স্বভাব তোমার, একনিষ্ঠ বিহারীলালের নয়। তোমার এই স্বভাব আমাকে দুঃখ দেয়। আবার এই স্বভাবই আমাকে তোমার দিকে অমোঘ টানে টেনেছে—যত তুমি অন্য নারীর কথা আমাকে জানিয়েছ ইশারায়, ইঙ্গিতে, ততই মনে হয়েছে তোমাকে সবদিক থেকে নাগপাশের মতো জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলি। আজ সেই নাগপাশ থেকে তোমাকে চিরমুক্ত করে দিয়ে যাব। আমাকে তুমি ভুলে যাও ঠাকুরপো।

ঠাকুরপো, ইংল্যান্ড থেকে আমাকে লেখা তোমার একটি চিঠি আমার চোখের সামনে রয়েছে। একটির পর একটি এই

রকম চিঠি আমার যন্ত্রণা, আমার একাকিত্ব বাড়িয়ে দিল একদিকে। অন্যদিকে আমার হৃদয়ে আর কারও জন্যে এতটুকু জায়গা রাখল না। সবটুকু জিতে নিল তোমার চিঠি—তুমিই হয়ে দাঁড়ালে আমার জীবনের একমাত্র অধীশ্বর। কবি বিহারীলালকে এতদিনে বড্ড সেকেলে লাগতে লাগল আমার, দেখলাম তোমার সঙ্গে তাঁর কোনও তুলনাই চলে না, তিনি আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে ঝরে গেলেন আমার জীবন থেকে।

আবার দ্যাখো, খেই হারিয়ে চোখের সামনে প্রবাস থেকে লেখার তোমার ওই চিঠিটা থেকে কতদূরে সরে এলাম—সেই চিঠিতে তুমি লিখেছ ঃ

'প্রাণের নতুনবউঠান,

সেদিন ফ্যান্সি-বল্-এ অর্থাৎ ছদ্মবেশী নাচে গিয়েছিলাম। কত মেয়ে-পুরুষ নানা রকম সেজেগুজে সেখানে নাচতে গিয়েছিল। প্রকাণ্ড ঘর, গ্যাসের আলোয় আলোকাকীর্ণ, চারদিকে ব্যান্ড বাজছে, ছ-সাত-শো সুন্দরী, সুপুরষ। ঘরে ন স্থানং তিলধারয়েৎ। চাঁদের হাট তো তাকেই বলে। এক-একটা ঘরে দলে-দলে স্ত্রী-পুরুষ হাত ধরাধরি করে ঘুরে-ঘুরে নাচ আরম্ভ করেছে, যেন জোড়া-জোড়া পাগলের মতো। এমন ঘেঁষাঘেঁষি যে কে কার ঘাড়ে পড়ে ঠিক নেই। একটা ঘরে শ্যাম্পেনের কুরুক্ষেত্র পড়ে গিয়েছে, মদ্যমাংসের ছড়াছড়ি, সেখানে লোকারণ্য। এক-একটা মেয়ের নাচের বিরাম নেই,

দু-তিন ঘণ্টা ধরে ক্রমাগত তার পা চলছে। মন অধিকার করবার যত প্রকার গোলাগুলি আছে বিবিরা তা অকাতরে নির্দয়ভাবে বর্ষণ করছেন। কিন্তু ভয় কোরো না নতুনবউঠান, আমার মতো পাষাণ হৃদয়ে তার একটু আঁচড়ও পড়েনি। একজন দিশি মেয়ে সেজে গিয়েছিলেন—তাঁকে ভিড়ের মধ্যেও আলাদা করে দেখতে পেলাম। একটা শাড়ি, একটা কাঁচুলি তাঁর প্রধান সজ্জা, তার ওপরে একটা চাদর পরেছিলেন, তাতে ইংরিজি কাপড়ের চেয়ে তাঁকে ঢের ভালো দেখাচ্ছিল। এই ছদ্মবেশী নাচের পার্টিতে আমি সেজে ছিলাম বাংলার জমিদার। জরি দেওয়া মখমলের কাপড়, জরি দেওয়া মখমলের পাগড়ি, ইত্যাদি। এই পর্যন্ত বেশ ছিল। কিন্তু জনকতক ব্যক্তি আমাকে জোর করে দাড়িগোঁফ পরালেন। আর দু-একজন মহিলা আমাকে বললেন, দাড়ি-গোঁফে বেশ মানিয়েছে আমাকে, ভারী ভালো দেখাচ্ছে। কিন্তু নতুনবউঠান, যে-সকল সুন্দরীদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে এখানে, তাঁরা কেউই দাড়ি-গোঁফধারী আমাকে চিনতে না পারায় আমি কাছে যেতেই তাঁরা সরে পড়তে লাগলেন! শেষ পর্যন্ত দাড়ি-গোঁফ উৎপাটন করে আমাকে নিজরূপে প্রকাশিত হতেই হল নতুনবউঠান।'

ঠাকুরপো, তোমার এ-চিঠি পেয়ে আমি মজা পেয়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু বুকের মধ্যে হু-হু করেও উঠেছিল। আমি স্পষ্ট

যে দেখতে পাচ্ছিলাম, ওই শাড়ি আর কাঁচুলি পরা বিদেশিনী সুন্দরীর সঙ্গে তুমি নাচছ—তোমার সঙ্গে নাচতে-নাচতে খুলে গিয়েছে তার পোশাকের ওপরে ঢাকনার মতো চাদরটি—তুমি আর সে পাগলের মতো শুধু নাচছ, তোমরা এত ঘেষাঘেঁষি যে দুজনকে কিছুতেই আলাদা করতে পারছি না আমি। একলা ঘরে এ-চিঠি বুকে জড়িয়ে ধরে কত কেঁদেছি ঠাকুরপো। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করেছে তোমার কাছে—চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছে, ফিরে এসো ঠাকুরপো!

বিলেত থেকে তুমি যেসব চিঠি লিখেছ আমাকে, তাদের অনেকটাই জুড়ে আছে তোমার মুক্ত নারীসঙ্গের আনন্দ—যেমন নারীর সঙ্গ তুমি এদেশে চাইলেও পাবে না, লিখেছ তাদেরই কথা। এই সুন্দরী বিদেশিনীদের ভিড়ে আমি কোথায় হারিয়ে গেছি ঠাকুরপো! এসব চিঠি-পড়তে পড়তে খালি মনে হত, তোমার জীবন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছি আমি। আমি সহ্য করতে পারতাম না। আর সেইজন্যই বেশি করে চাইতাম তোমার সঙ্গ—ক্রমশই বুঝতে পারছিলাম তোমার কোনও বিকল্প নেই আমার জীবনে। মনে মনে ভাবতাম, একবার ফিরে এসো, তোমাকে সবদিক থেকে জড়িয়ে-জড়িয়ে আমি গ্রাস করে ফেলব—কোনও মুক্তির পথ থাকবে না তোমার।

কেন ঠাকুরপো, কেন কেন তুমি লিখেছিলে এ-রকম

চিঠি? তোমার আধুনিক মন আমাকে কষ্ট দিয়ে-দিয়ে পাগল করে তোমার প্রেমে পতঙ্গের মতো আটকে ফেলতে চেয়েছিল? তুমি লিখেছিলে লন্ডন থেকে—

'গত মঙ্গলবারে একজনের বাড়িতে একটি নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। আমি পরেছিলাম নাচপার্টির উপযুক্ত পোশাক। আমার শার্টটি ছিল একেবারে নিষ্কলঙ্ক ধবধবে সাদা। তার ওপরে প্রায় সমস্ত বুকখোলা এক বনাতের ওয়েস্টকোট। ওয়েস্টকোটের মধ্যে সাদা শার্টের সমুখ দিকটা বেরিয়ে। গলায় সাদা নেকটাই। হাতে ছিল একজোড়া সাদা দস্তানা। নতুনবউঠান, দস্তানা বিলেতের শীতের জন্য নয়। যে-মহিলাদের হাতে হাত দিয়ে নাচব, আমার খালি হাত লেগে তাদের হাত যাতে ময়লা না হয়, সেই জন্য দস্তানা। রাত সাড়ে ন'টায় গিয়ে পৌঁছেছিলাম নাচ পার্টিতে—ঘরের মধ্যে রমণীদের রূপের আলো গ্যাসের আলোকে ম্রিয়মাণ করে দিয়েছে!

নতুনবউঠান, সেই নাচঘরে ঢুকে মনে হল, রূপের উৎসব পড়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করা মাত্রই চোখে বাঁধা লেগে গেল। ঘরের একপাশে পিয়ানো, বেহালা, বাঁশি বাজছে, ঘরের চারিধারে কৌচ চৌকি সাজানো, ইতস্তত দেয়ালের আয়নার ওপর গ্যাসের আলো ও রূপের প্রতিবিম্ব পড়ে ঝকমক করছে।

নতুনবউঠান, একটা কথা তোমায় না বলে পারছি না। এ-আমার স্বীকারোক্তি। নাচবার ঘরের মেঝেটি ছিল কাঠের। তার ওপর কার্পেট পর্যন্ত পাতা নেই। সে কাঠের মেজে এমন পালিশ করা যে পা পিছলে যায়। তবে তোমার এই দেওরটি ক্রমেই আবিষ্কার করেছে যে, ঘর যত পিছল হয়, ততই নাচবার উপযুক্ত হয়। কেননা একমাত্র পিছল ঘরেই আমার অপটু নাচের গতি সহজ হয়, পা কোনও বাঁধা পায় না, আপনা-আপনি পিছলে যার কাছে যেতে চাই তার কাছেই চলে আসে।

নতুনবউঠান, সাহেবমেমেদের রোম্যান্টিক কল্পনার তারিফ না করে পারছিনে। ঘরের চারিদিকে যে-বারান্দাগুলি আছে তাই গাছপালা দিয়ে ঢেকে কৌচ চৌকি রেখে বানানো হয়েছে প্রণয়ীদের জন্য মনোরম কুঞ্জ। এর বেশি আর বলছি না, বাকিটুকু তুমি কল্পনা করে নিতে পারো। নাচতে-নাচতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ওই মনোরম প্রেমকুঞ্জই বিশ্রামের উপযুক্ত জায়গা—বিশেষ করে বয়েস যাদের অল্প, তাদের জন্যই এই প্রেমকুঞ্জের বিশেষ আয়োজন।

এই প্রণয়কুঞ্জেই আকস্মিক দেখা পেয়েছি তার! তাকে দেখে একেবারে চমকে উঠেছি আমি—এই শত শ্বেতাঙ্গিনীদের মধ্যে একটি ভারতবর্ষীয়া শ্যামাঙ্গিনী রয়েছে। দেখেই তো আমার বুকটা একেবারে নেচে উঠল। তার সঙ্গে

কোনওমতে আলাপ করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেম। কতদিন শ্যামলা মুখ দেখিনি! সত্যি বলছি বউঠান, তোমার মুখটা তোমার চোখ দুটো তাই এই শ্বেতাঙ্গিনীদের দেশে বারেবারে মনে পড়ে। তবে এই শ্যামাঙ্গিনীর মুখটি . ার মতো নয়, এর মুখে আমাদের বাঙালি মেয়েদের ভালোমানুষি নম্রভাবে মাখানো। তোমার চোখেমুখে নতুনবউঠান যে ধীময় দুষ্টুমির ভাবটি আছে, তা নেই এই শ্যামাঙ্গিনীর মুখে। মেয়েটির চুল বাঁধা আমাদের দেশের মতো। সাদা মুখ আর উগ্র অসংকোচ সৌন্দর্য দেখে দেখে আমার মনের ভিতরটা ভিতরে-ভিতরে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিল—এতদিনে তাই বুঝতে পারলেম। নতুনবউঠান, বিকেল চারটে বাজতে চলল, তবু অন্ধকার হয়ে আসছে। আজ সারাদিন মেঘ, বৃষ্টি, বাদল, অন্ধকার, শীত। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয়, তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়—তাতে একটা কেমন উল্লাসের ভাব আছে। এখানে তা নয়, এখানে টিপটিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতিনিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলছে তো চলছেই। আমাদের দেশে স্তরে স্তরে মেঘ করে। এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না মেঘ করেছে, মনে হয় কোনও কারণে আকাশের রঙটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর-জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। তারই মধ্যে আমার হঠাৎ মনে পড়ছে প্রণয়কুঞ্জে হঠাৎ দেখা সেই শ্যামাঙ্গিনীর মুখ!'

ঠাকুরপো, এ-চিঠির শেষে তুমি 'পুনশ্চ' দিয়ে লিখেছ—'নতুন বউঠান, ইটালি থেকে তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি। মনে পড়ে গেল, ইটালির মেয়েদের বড় সুন্দর দেখতে। অনেকটা আমাদের দেশের মেয়ের ভাব আছে। সুন্দর রং, কালো কালো চুল, কালো ভুরু, ভালো চোখ, আর মুখের গড়ন চমৎকার।' আমাকে তোমার অন্য নারীসঙ্গের কথা জানিয়ে আঘাত করতে তোমার ভালোলাগত ঠাকুরপো—এই ছিল তোমার আধুনিকতার নিষ্ঠুরতা। আমি যত এইভাবে আঘাত পেয়েছি, ততই হয়তো তোমাকে আরও তীব্রভাবে ভালোবেসেছি। তুমি যে বিহারীলাল নও, তোমার প্রেমে যে খোঁচা আছে, তির্যক আঘাত হানতে পারো তুমি—এসব যত জেনেছি ততই যেন আরও জানবার জন্য মন আমার তৃষ্ণার্ত হয়েছিল। বিহারীলালকে আসন উপহার দেওয়ার পর তিনি লিখলেন—তোমার আসনখানি / আদরে আদরে আনি / রেখেছি যতন করে / চিরদিন রাখিব।

ঠাকুরপো তোমার কাছ থেকে ছোট-ছোট আঘাত পেতে-পেতে বিহারীলালের গদগদ সমর্পণের ভাবটিকে আমার ক্রমে সেকেলে লাগছিল—এ-কথা অকপটে স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি যখন সুদূর বিলেত থেকে বিদেশিনীদের রূপের কথা লিখতে, তখন আমার বুকের মধ্যে ঈর্ষার যন্ত্রণাও অনুভব করেছি। কী যে ভয় করত আমার—তুমি যদি আর আমার

না থাকো! কী নিয়ে থাকব আমি ঠাকুরপো!

ঠাকুরপো, একলা থাকতে-থাকতে আর নানারকম গঞ্জনা শুনতে-শুনতে এক সময়ে ভাবতে শুরু করেছিলুম, এই রকমই মেয়েমানুষের জীবন। তোমার নতুনদাদা মাঝে মধ্যে আমায় ঘোড়ায় চড়িয়ে গড়ের মাঠে নিয়ে যেতেন বটে, তবে সেটা ছিল তাঁর বড়মানুষি খেয়াল। আমার মনের খবর, আমার গভীর কিছু চাহিদার খবর তিনি রাখতেন বলে মনে হয় না।

তুমি যেই বিলেত থেকে ফিরে এলে ঠাকুরপো অন্য সুর বাজল আমার জীবনে। কেন যে তুমি আমার জীবনে এইভাবে উজানের মতো এসেছিলে। তুমি ওইভাবে মহাসমারোহে আমার জীবনে না এলে তোমার চলে যাওয়াটা আমাকে এতখানি নিঃস্ব করে দিত না।

একটি দুপুরবেলার কথা আমি ভুলব না কোনওদিন। সেদিন আমার খুব জ্বর ছিল। তুমি পাশে বসে পাখার হাওয়া করছ আমাকে। আমি জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে আছি।

তুমি হঠাৎ বললে, 'এতদিন আমার জীবনে নারী বলে যেন কিছুই ছিল না। নারী বলে যে কিছু আছে তা তো এতদিন বুঝতেই পারিনি। সে একরকম মন্দ ছিল না। নতুনবউঠান, যেই তুমি এলে আমার জীবনে, তোমার ভিতর দিয়েই যেন নারীকে চিনলুম।' তোমার কথা শুনে আমার

চোখে জল এল ঠাকুরপো। আমি গরিব ঘরের মেয়ে। খুব যে আদর যত্নের মধ্যে বড় হয়েছি, তা তো নয়। ভালোবাসার জন্য বড্ড তেষ্টা ছিল মনের মধ্যে। বিয়ের পরে তোমাদের বাড়ির বউ হয়ে এসে একমাত্র তোমার কাছেই জীবনে প্রথম আদরযত্ন, ভালোবাসা পেয়েছিলাম। তোমাকে তাই প্রথম থেকেই আমি কাছে টেনে নিয়েছিলাম। তার মধ্যে কোনও মিথ্যা ছিল না।

তোমার কথার উত্তরে সেদিন বলেছিলাম—

'আমার ভিতর দিয়ে তুমি যে নারীকে চিনতে পেরেছ, সে-নারী তো কেবল আমি। আমাকে জানলে মেয়েজাতটাকেই জানা হয়ে গেল, এমন ঠুনকো কথা তোমাকে মানায় না ঠাকুরপো। তাছাড়া, আমি অতি সাধারণ এক গৃহবধূ—তার মধ্যে নারীজাতির কতটুকুই বা প্রকাশ পেতে পারে?'

তুমি উত্তরে বলেছিলে, 'নতুনবউঠান, তুমি জানো, মাকে আমি বেশি পাইনি। তোমার মতো আমার ছোটবেলাটাও কেটেছে আদরযত্নের অভাবে। মায়ের ঝোঁক ছিল জ্যোতিদাদা আর বড়দার ওপরেই। আমি ছিলুম তাঁর কালো ছেলে। মা যেদিন আমাদের জীবন থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন, তুমি এলে আমার জীবনের সবটুকু জুড়ে।'

তোমার কথা শুনে আমি বলেছিলাম, 'ঠাকুরপো, তোমাকে আমি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলাম সব দিক থেকে—তুমি

যাকে বলেছ নাগপাশের বন্ধন। ধীরে ধীরে আমার শরীর-মন তোমার ডাকে সাড়া দিল। কিন্তু তা বলে তুমি যদি বলো আমার ভিতরেই তুমি জানতে পেরেছ সমগ্র নারীজাতিকে, সেই ভার আমি বহন করতে পারব না ঠাকুরপো। আমি অতি সাধরণ মেয়ে।'

তুমি বললে, 'নতুনবউঠান, তুমি আমার জীবনে আসার আগে কিন্তু বুঝিনি মেয়েরা কত ভালোবাসা, কত আদর ঢেলে দিতে পারে একটা পুরুষের জীবনে। আমি এ-বাড়ির কালো ছেলে। সেই কালো ছেলেকে তুমি এমন ভালোবাসলে কী করে?'

এ-কথা শুনে আমি তোমার হাতটি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে আমার বুকের মধ্যিখানটিতে রেখে দিলাম অনেকক্ষণ। মনে হল সেখানকার জ্বালা একটু কমছে।

ঠাকুরপো, ১৮৭৮ থেকে ১৮৮০—এ-দু'বছরে আমি একটি কথা ক্রমে বুঝতে পেরেছিলাম, তোমাকে না পেলে আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই দু-বছর তুমি ছিলে বিলেতে। আর আমি ছিলাম দিনরাত তোমার বিরহে। যত দিন গিয়েছে, তত বেশি কষ্ট পেয়েছি। এত কষ্ট হয়তো পেতাম না, যদি আমার একটি সন্তান থাকত। তাকে অবলম্বন করেই না হয় বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতাম। ঠাকুরপো, সন্তান না-হওয়ার সব দায়িত্বই, সব অক্ষমতাই আমার ওপর বর্তালো। কোনও

ডাক্তারিপরীক্ষা হয়নি, অথচ আমাকেই বহন করতে হল বন্ধ্যাত্বের বদনাম। তোমাকে সব কথা বলতে পারব না, কিন্তু এই বদনাম সহ্য করার নিঃসঙ্গ অপমান থেকে কেউ আমাকে বাঁচালেন না—তোমার নতুনদাদাও নন! আমার যে সন্তান হল না তার জন্য জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির নির্মম পরিবেশে আমিই দায়ী রয়ে গেলাম চিরকাল!

ঠাকুরপো, তুমি যখন বিলেতে, তখন কিছুদিনের জন্য আমার কোলজুড়ে, বুকজুড়ে পেলাম তোমার ন'দিদি স্বর্ণকুমারীদেবীর ছোট্ট মেয়ে ঊর্মিলাকে। সে সারাদিন থাকত আমার কাছেই। যেন আমিই তার মা। আমি তাকে খাওয়াতাম, পড়াতাম, শোয়াতাম, খেলতাম তার সাথে। আমি তার মামি। হয়ে উঠলাম না। মাতৃত্বের সেই স্বাদ—যা ক্ষণিকের জন্য এসেছিল আমার জীবনে—তা কোনওদিন আমার পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেটা ছিল ১৮৭৯-র ৩১ ডিসেম্বর—আমার জীবনের এক ভয়ঙ্কর দিন। তোমার চিঠি এসেছিল বিকেলের ডাকে। এই তো সেই চিঠি—একেবারে আমার চোখের সামনে—

'নতুনবউঠান,

এদেশে যে মেয়েরা সুন্দরী তাঁরা জানেন, তাঁরা সুন্দরী। বিলেতে আত্মসৌন্দর্য-অনভিজ্ঞা যুবতী দেখবার জো নেই। এখানে সৌন্দর্যের পূজা হয়। আমাদের দেশের পুরুষ এইভাবে

নারীর তনুশ্রীর প্রকাশ্য পূজা করতে হাজার কুণ্ঠায় ভোগেন। তাই আমাদের দেশের সুন্দরীরা বিশ্বাস করতে শেখেননি তাঁরা সুন্দরী। তাঁদের শারীরিক আবেদনের অনেকটাই তাই মাঠে মারা যায়। বিলেতে ঠিক উলটো। এখানে রূপ কোনওমতে গুপ্ত থাকতে পারে না। রূপাভিমান সুপ্ত থাকতে পারে না। চারদিক থেকে প্রশংসার কোলাহল তাকে জাগিয়ে তোলে। রূপের আলো দেখবা মাত্র ভক্তদের পতঙ্গহৃদয় চারদিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে তাকে ঘিরে ফেলে ও রূপসী যেদিকে যান সেই ফড়িঙের দল তার চতুর্দিকে লাফিয়ে চলতে থাকে। বল্-রুম নৃত্যে সুন্দরী রমণীর দাম অত্যন্ত চড়া। নাচে সেই রমণীর সান্নিধ্যসুখ পাওয়ার জন্যে দরখাস্তের স্রোত বইতে থাকে। তাঁর হস্তচ্যুত রুমাল কুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে পুরুষের শত শত মুগ্ধ হাত প্রস্তুত। তাঁর তিলমাত্র কাজ করে দেওয়ার জন্যে শত পুরুষ কায়মনোবাক্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত। নতুনবউঠান, এই তো গেল রূপসীদের চড়া দামের কথা। এবার আমার মতো রূপবান তরুণদের প্রসঙ্গে আসা যাক। বলরুম-নৃত্যে তোমার এই দেওরটিরও যথোচিত আদর আছে। আমি এখানকার কিছু-কিছু ড্রয়িংরুমের ডারলিং হয়ে উঠেছি—এ-কথা বললে খুব একটা মিথ্যে বলা হবে না। তবে একথা বলছি না যুবতীরা ইতিমধ্যেই আমাকে তাদের আদর দিয়ে-দিয়ে অনর্থ করে তুলেছে—যদিও অদূর ভবিষ্যতে সেই

সম্ভাবনা নেই এমন কথাও বলছি না।

নতুনবউঠান, আমি নিশ্চিত এ-কথা শুনে তোমার এখানে আসতে অত্যন্ত লোভ হবে। তোমার মতো শ্যামল সুন্দরী বিলেতের মতো রূপমুগ্ধ দেশে এলে এখানকার হৃদয়রাজ্যে এত ভাঙচুর লোকসান হতে পারে যে, সে একটা নিদারুণ করুণরসোদ্দীপক ব্যাপার হয়ে উঠবে। হে আমার বউঠাকরুণ, এদেশে এমত অবস্থায় তোমার হৃদয়টিকেও যে খরচের খাতায় লিখতে হবে! এদেশে এলেই বুঝবে, এখানে রূপের মতো সুপারিশপত্র আর নেই। আমাদের দেশের রূপবতীদের ভাগ্য নিতান্তই মন্দ। তাদের রূপ অন্দরমহলের চৌহদ্দি পেরতে পারে না। বাইরের জগতে সেই রূপের কোনও অধিকার নেই। আধিপত্য নেই।

এবার এদেশে আমার অবস্থার একটু বিশদ বিবরণে আসা যাক। বিলেতে আমার বিশেষ ভাব হয়েছে দুই সুদর্শনা 'মিস'-এর সঙ্গে। একটি নিমন্ত্রণসভায় এই দুই রূপসীশ্রেষ্ঠ 'মিস' কেমন চুপচাপ গম্ভীর হয়েছিলেন। ছোট 'মিস' একটা কৌচে গিয়ে হেলান দিয়ে বসলেন, আর বড় 'মিস' দেয়ালের কাছে এক চৌকি অধিকার করলেন। এদের এই গাম্ভীর্যের কারণ হয়তো এই যে আমি ছাড়া ঘরে আর কোনও যুবক ছিল না। তরুণনেত্র তাঁদের রূপ ও সাজসজ্জা যেমন উপভোগ করতে পারে এমন তো আর চশমাচক্ষু পারে না। যাইহোক,

আমি যতদূর সম্ভব 'মিস'-দ্বয়কে আমোদে রাখবার জন্যে নিজেকে নিযুক্ত করলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি কথোপকথন শাস্ত্রে তেমন বিচক্ষণ নই। এখানে যাকে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব বলে, তাও নই। অনর্গল গল্প হাসি আসে না। আকারে-ইঙ্গিতে কথার আভাসে আমি রূপসীকে জানিয়ে দিতে পারি না যে, আমার চকোরনেত্র তাঁর রূপের জ্যোৎস্না ও আমার কর্ণচাতক তাঁর বাক্যধারা পান করে স্বর্গসুখ ভোগ করছে।

তাই মিস-দ্বয়কে একটি গান গেয়ে শোনালাম।

আমার গান দুই 'মিস'-এরই ভালো লাগল বলে মনে হল। ছোট 'মিস' আমাকে গানটি ইংরিজিতে অনুবাদ করে বলতে অনুরোধ করলেন। আমি অনুবাদ করলেম—বউঠাকরুণ, গানটি হল—প্রেমের কথা আর বোলো না।

ঠাকুরপো, তোমার এই দীর্ঘ চিঠিটি পড়তে-পড়তে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, তুমি যেন আর আমার সেই চেনা মানুষটি নও। বিলেত তোমাকে অনেক বদলে দিয়েছে। এদেশে ফিরে এসে তোমার এই নতুনবউঠানকে আর ভালো লাগবে না। এক পাগল হাওয়ার বাদল দিনে তুমিই আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলেছিলে ঠাকুরপো, আমার চোখের চাওয়ার হাওয়া দোলায় তোমার মন। বলেছিলে, আমি আছি বলে তোমার ভাষায় লাগে সুরের আবরণ। বলেছিলে, আমার ছোঁয়ায় তোমার হৃদ্‌গগণে দেখা

দেয় সোনার মেঘের খেলা। নীলনয়নাদের দেশ থেকে ফিরে বাংলার এই কালো মেয়ের চোখের চাওয়ায়, শরীরের স্পর্শে আর কি কিছুই পাবে তুমি? এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে আমি অমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ছোট্ট ঊর্মিলা যে কখন আমার চোখের আড়ালে চলে গেছে, খেয়াল করিনি। সে নড়বড়ে পায়ে ছাদের পিছনে লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে নীচে যাচ্ছিল। টাল সামলাতে পারল না। পড়ে গেল গড়াতে-গড়াতে। মাথায় লাগল আঘাত। হঠাৎ নীচে কাজের লোকদের চেঁচামেচিতে আমার ঘোর ভাঙল। আমি দৌড় নীচে গেলাম। ঊর্মিলা ততক্ষণে নিথর হয়ে গেছে। তার প্রাণটুকু বেরতে বেশি সময় লাগেনি। সেই থেকে নিজের কাছে বড় অপরাধী হয়ে আছি। দায়ী করছি নিজেকে। আমার পাপের জন্যই কি মরতে হল ঊর্মিকে? ঠাকুরপো, তোমার প্রতি আমার এই প্রেম—এ অন্যায়, অন্যায়। একদিন ঊর্মিকে মরতে হল। আজ আমাকে মরতে হচ্ছে। হয়তো তুমিও কষ্ট পাবে, তছনচ হবে আজীবন।

আমার প্রাণের রবি, বেলা পড়ে আছে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে সন্ধের দিকে। আমার জীবনের শেষ সূর্যাস্ত, শেষ সন্ধে। সেই সকাল থেকে লিখছি। মনের মধ্যে ক্রমশ জমে উঠছে

মেঘ, স্মৃতির বিদ্যুৎ চমকে উঠছে ঝোড়ো বাতাসে। মনে পড়ছে, দু-বছর পরে ফিরে এলে তুমি বিলেত থেকে। শেষ হল আমার বিরহের বেলা, আকাশকুসুম চয়ন। জোয়ার এল আমার জীবনে—তোমাকে ফিরে পাওয়ার আনন্দের জোয়ার। তুমিও যেন গানে সুরে কবিতায় প্রেমের উজান হয়ে ফিরে এলে। আমরা আমাদের প্রাণের খুশি কিছুতেই চেপে রাখতে পারিনি। প্রকাশ ঘটল তার আকাশে-বাতাসে, লতায়-পাতায়, দিনের আলোয়, রাতের অন্ধকারে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি হঠাৎ উপচে পড়ল তোমার-আমার প্রাণের সুন্দনে। তুমি তখন উনিশ। আমি একুশ। ঠাকুরপো, শুধু তুমি তো ফিরে এলে না, আমার মনে হল, তুমি আমার জীবনে ফিরিয়ে আনলে সেই চাঁদ, সেই ছাদ, সেই দক্ষিণে বাতাস। তুমি লিখতে লাগলে রোজ নতুন-নতুন গান আমারই জন্যে, আমারই প্রেরণায়! দুপুরবেলা আমার পাশে খাটে বসে বসে কত কবিতা লিখতে তুমি—ছবির মতো ভেসে উঠছে সেই সব স্মৃতি। মনের মধ্যে ক্রমেই ঘন হচ্ছে মনকেমনের বাদল। ওই ঘন মেঘ আমাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে অন্য কথা—তোমার ফিরে আসার পর গড়ে উঠল তোমার-আমার এক গাঢ় গহন গোপন ভুবন। সেই পৃথিবী শুধু তোমার-আমার, আর কেউ নেই সেখানে, কারোর প্রবেশাধিকারই নেই।

তোমার-আমার প্রেমের প্রথম প্রকাশ ঘটল একটি বাগানের

মধ্যে। সেই বাগানের গাছে-গাছে ফুটে উঠল আমাদের ভালোবাসা, ফুলে-ফুলে রঙিন হয়ে থাকল আমাদের প্রাণের বাসনা। তুমি সেই বাগানের নাম দিলে নন্দনকানন—আমার ঘরের সামনে ছোট্ট ছাদটিতে দু'জনে মিলে তৈরি করলাম সেই বাগান।

আমরা দু'জনে কত সন্ধে-রাত কাটিয়েছি সেই নন্দনকাননে। দিনের শেষ সেখানে যেতাম গা ধুয়ে প্রসাধন শেষ করে তোমার গান শোনার জন্যে তৈরি হয়ে। সেখানে পাততাম মাদুর। মাদুরের ওপর তাকিয়া। খোঁপায় লাগাতাম বেলফুলের মালা। বেঁধে দিতাম তোমার কবজিতে বেলফুলের রাখি। আর বেলফুলের একটি গড়ে মালা ভিজে রুমাল দিয়ে ঢেকে রেখে দিতাম রূপোর রেকাবিতে। যেদিন হত পূর্ণিমা, সেদিন যে কী রূপ খুলত এই পরিবেশের! সব মনে পড়ছে আমার।

দক্ষিণের আকাশ থেকে উড়ে আসত হু-হু বাতাস। হঠাৎ গান গাইতে-গাইতে তোমার আবির্ভাব হত—যেন দেবদূত! তোমার সেই গান ছড়িয়ে পড়ত আকাশভরে, তারায়-তারায়।

একদিন হঠাৎ তুমি বললে, 'নতুনবউঠান, শুধু গান শুনলেই হবে না গো, গলা মেলাও আমার সঙ্গে।'

আমি পড়ে গেলাম মহা বিপদে। সংকোচ গলা চেপে ধরল আমার। বললাম, 'ঠাকুরপো, এ তোমার অন্যায় অনুরোধ, তোমার কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মেলানোর কণ্ঠ কোথায় আমার?'

তুমি বললে, 'নতুনবউঠান, ভেব না তোমার গান আমি লুকিয়ে চুরিয়ে শুনিনি। একটা কথা তোমাকে জানাই বউঠান, আমার গান তোমার মতন করে পৃথিবীর আর কোনও মেয়ে গাইতে পারে না। সুর যে তোমার রক্তে। তুমি সুর পেয়েছ জন্মসূত্রে, তোমার ঠাকুরদা জগন্মোহন গঙ্গোপাধ্যায় রাগসংগীতের সাধক, তোমার কণ্ঠে উপচে পড়ছে সুর—কণ্ঠ মেলাও আমার সঙ্গে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে শুরু হোক সংগীতচর্চার নতুন যুগ।'

ঠাকুরপো, একমাত্র তোমারই জন্যে আমি গেয়েছি—গেয়েছিল আমার প্রেম, আমার আদর। আমার প্রাণে যতটুকু সুর ছিল সব দিয়েছিলাম তোমাকেই। সে-গান কতদিন হল বন্ধ হয়ে গেছে। ঝরে গেছে নন্দনকাননের প্রাণ। অথচ একদিন আমার গান শেষ হতেই আমার দুটি হাত ঘনভাবে ধরলে তুমি তোমার হাতের মধ্যে, তোমার বুকের ওপর, যেন তোমার প্রাণের ওপর রাখলে আমার হাত, বললে, ধরণীতলে যে-ভাষায় শুধু তুমিই কথা বলতে পারো, 'নতুনবউঠান, কোমল তব কমলকরে, পরশ কর পরানপরে।'

মনজুড়ে মনকেমনের মেঘের মধ্যে আবার চমকে উঠল বিদ্যুৎ। ঠাকুরপো, আবার মনে পড়ে গেল অন্য এক পূর্ণিমার রাত, ওই নন্দনকাননেই। চারধারে চাঁদের আলো। চারধারে ফোটাফুলের মেলা। তারই মধ্যে এসে দাঁড়ালে তুমি—

দীর্ঘাঙ্গ, ঋজু, সুঠাম। তোমার নতুনদাদা খুবই রূপবান পুরুষ। কিন্তু তোমার রূপে আগুন আছে রবি—সে-আগুন তোমার প্রাণের, তোমার গানের, সে-আগুন ছড়িয়ে যায় সবখানে, সেই আগুনেই পুড়েছি আমি, আরও কত নারী পুড়বে তোমার চলার পথে-পথে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে নন্দনকানন। তুমি এসে দাঁড়ালে সেখানে। মনে হল, পূর্ণিমার গায়েও আগুন লাগালে।

সেই আগুন আমার চোখে চোখ রাখল। সেই আগুন আমার কাঁধে হাত রাখল। সেই আগুন তার বুকের মধ্যে আমাকে বলল—'নতুনবউঠান, তোমাকে আমার হৃদয়কথা জানিয়ে একটি গান লিখেছি আজ, তাকে বসিয়েছি 'ছায়ানট' রাগিনীতে।' সেই আগুন সত্যিই গেয়ে উঠল—পৃথিবীতে শুধু আমারই জন্যে ঃ

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা,
এ সমুদ্রে কভু হব নাকো পথহারা।।
যেথা আমি যাই নাকো তুমি প্রকাশিত থাকো,
আকুল নয়নজলে ঢালো গো কিরণধারা।।
তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে,
তিলেক অন্তর হলে না হেরি কূল-কিনারা।
কখনো বিপথে যদি ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি
অমনি ও মুখ হেরি শরমে সে হয় সারা।।

রবি, তোমার কণ্ঠে এ-গান আমার চেতনার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শুনবে আমার বিশ্বাসহীন, বিক্ষত হৃদয়। তোমার মনে আছে কী বলেছিলে, কেমনভাবে বলেছিলে তুমি আমাকে গানের কথাগুলি? আমি তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে, তোমার বুকের ওপর মাথা রেখে, তোমার আগুনে পুড়তে-পুড়তে বিশ্বাস করেছিলাম রবি, আমি সত্যিই তো তোমার জীবনের ধ্রুবতারা, আর কোনও পথ তোমাকে ডাকবে না, ডাকলেও সাড়া পাবে না তোমার, জীবনসমুদ্রে তোমাকে আমি, আমাকে তুমি, হারাব না কোনওদিন। বিশ্বাস করেছিলাম, তুমি যেখানেই যাও যার কাছেই থাকো, তোমার জীবনে আমার প্রকাশ আর কখনও অন্য কোনও প্রেম আচ্ছন্ন করে দেবে না। বিশ্বাস করেছিলাম, ঠাকুরপো, তুমি বোঝো আমার দহন, আমার কান্নার মর্যাদা আছে একমাত্র তোমার প্রেমে—আমার নয়নজলের আলো সত্যিই তুমি বুঝি দেখতে পাও। ঠাকুরপো, আমার সহজ সরল ভালোবাসা বিশ্বাস করেছিল, আমি তোমার জীবন থেকে যদি মুহূর্তের জন্যেও সরে যাই, জীবনসমুদ্রে হারিয়ে ফেলবে তুমি কূলকিনারা। আমার মুখ সর্বদা জেগে আছে সংগোপনে তোমার মনের মধ্যে, সেখানে অন্য কোনও মুখ যদি হঠাৎ দেখা দেয়, তুমি লজ্জায় মরে যাবে ঠাকুরপো—এ-কথা বিশ্বাস করেছিলাম আমি।

আমি কেমন কবে বিশ্বাস করব বলো, মাত্র ক'মাসের

মধ্যে তুমিই বদলে যাবে এতটা—লিখতে পারবে—
হেথা হতে যাও পুরাতন।
হেথায় নতুন খেলা আরম্ভ হয়েছে।

আমার হৃদয় শুধু বলছে, অসম্ভব এ অসম্ভব। ঠাকুরপো, আজও তো শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের মাথায়। আজও তো খর বিদ্যুৎ খানখান করে রাতের বক্ষ, আজও তো বুকের মধ্যে শুনেত পাই বারুণীনদীর তরল রব, শুনতে পাই রিমঝিম ঘন বর্ষণে সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে কাজরি গাথা, আজও তো তোমার বাহুতে মাথা রেখে তোমার সঙ্গে আবার দেহে মনে এক হয়ে যেতে ইচ্ছে হয় ঠাকুরপো—তবু আমার টুকরো-টুকরো হৃদয় শুধু বলছে, অসম্ভব সে অসম্ভব! ঠাকুরপো কেন এমন হল? কেন তুমি কথা রাখলে না? আমি যে তোমাকে বড্ড বিশ্বাস করেছিলাম রবি।

প্রাণের রবি, তুমি ফিরে এলে বিলেত থেকে। ঠাকুরবাড়িতে এল গান-বাজনার, আনন্দের সৃজনের, মননের নতুন যুগ। ১৮৮২-র মধ্যে সত্যিই ঠাকুরবাড়িতে ঘটল সংস্কৃতির নবজাগরণ। আর তোমার প্রেমের প্রেরণায় সেই সমারোহের কেন্দ্রে সরে এলাম আমি! শ্যাম গাঙ্গুলির তিন নম্বর মেয়ে। যার না আছে শিক্ষার গৌরব। না আছে রূপের জৌলুস। রবি, তুমি আমাকে ভালোবাসলে বলেই তো তোমার হাত ধরে আমি দাঁড়লাম সেই নবজাগরণের প্রাণদুহিতা হয়ে।

তোমার সুরে-গানে-কবিতায়-নাটকে হইচই ফেলে দিলে তুমি—তোমার প্রাণের বন্যায় ভেসে গেল যেন সারা বাংলাদেশ। আর আমি তোমার অলৌকিক সৃজনস্রোতে জলকন্যার মতো ভাসতে লাগলাম। মনে হল সবাইকে বলি, দুয়ো দুয়ো দুয়ো। তুমি একদিন বাড়ির থিয়েটার মঞ্চের পরদার আড়ালে আমার কানের লতিতে ছোট্ট কামড় বসিয়ে বললে, 'নতুনবউঠান, তুমিই আজ থেকে বঙ্গমজলিসের মক্ষীরানি—এ তোমার পাকা আসন। জেনে রেখো।'

এতদিন যিনি কেন্দ্রে ছিলেন, যিনি তাঁর বিলিতি শিক্ষাদীক্ষার গৌরবে ভেবেছিলেন এটি তাঁরই পাকা আসন, তিনি মেজবউঠাকরুণ।

ঠাকুরপো, যেদিন জ্ঞানদানন্দিনীর চোখে দেখলাম আগুন—রাগ, অভিমান, ঈর্ষার আগুন—যে-আগুন ক্ষণে ক্ষণে বর্ষিত হতে লাগল আমারই ওপর, সেদিন যে ভয় করেনি, তা নয়। মনে হয়েছিল এ-বাড়িতে যদি কেউ আমার সর্বনাশ চান তো তিনি! তবু তুমি ছিলে আমার একান্ত আশ্রয়, আমার পরম ভরসা। আমি সবাইকে দেখিতে দিতেও চেয়েছিলাম, যে-মেয়েটিকে ওঁরা কোনওদিন দিলেন না ঠাকুরবাড়ির যোগ্যতার মর্যাদা, যে-মেয়েকে অপমানিত হতে হয়েছিল পদে পদে, সেই মেয়েই পারল ঠাকুরবাড়ির ভাবনাভুবনের চাবিটি তার আঁচলে বাঁধতে। তুমি আমার হাত ধরেছিলে বলেই আমার

সমস্ত সাধারণত্ব পেরিয়ে আমি উত্তীর্ণ হয়েছিলাম ইচ্ছাপূরণের এক অলীক তুঙ্গে। তখন কী জানতাম ঠাকুরপো, আমি আসলে পুঁতেছি আমার বিজয়বৈজয়ন্তী চোরাবালির ওপর!

তোমার নতুনদাদা লিখলেন নতুন নাটক অলীকবাবু। সে নাটকে আমি সুযোগ পেলাম একেবারে নায়িকার ভূমিকায়। জ্ঞানদানন্দিনী মোটেই ভালো চোখে দেখলেন না ব্যাপারটা। কিন্তু তাঁর তো আর নায়িকা হওয়ার বয়েস নেই। তাঁকে মেনে নিতেই হল নায়িকা হিসেবে আমাকেই। তাঁর প্রিয় দেওর 'নতুন'-কে তিনি নিশ্চয় দু-চার কথা বলেছিলেন আমার বিরুদ্ধে—কিন্তু তেমন কোনও কাজ হয়নি তাঁর কথায়।

কিন্তু ওই নাটকে আমার প্রেমিক, অলীকবাবুর ভূমিকায় যে তুমি! আজ চিরকালের জন্যে চলে যাবার দিনে মনে হচ্ছে, সেটা ছিল একটা সূক্ষ্ম ফাঁদ। এবং আমি—একা আমি —সেই ফাঁদে পা দিয়েছিলাম। নিজের সর্বনাশ আমি নিজেই ডেকে এনেছি ঠাকুরপো। তোমাদের কারও গায়ে কোনও আঁচড়, কোনও আঁচ লাগবে না কোনওদিন।

সেদিন বিকেলবেলা চলছে অলীকবাবু নাটকের মহড়া। মহড়ায় উপস্থিত স্বয়ং নাট্যকার। এসেছেন মেজবউঠাকরুণ নিজে। চেয়ারে বসেছেন তিনি। তাঁরই পায়ের কাছে, তাঁর হাঁটুতে হেলান দিয়ে বসেছেন আমার স্বামী। বোঝা যায়, তাঁদের বসার ভঙ্গি থেকে, তাঁদের নিবিড় অন্তরঙ্গতা।

ইতিমধ্যে প্রায় প্রতিদিন নাটকের মহড়া দিতে-দিতে প্রায় প্রতিদিন তোমার প্রেমিকার ভূমিকায় অভিনয় করতে-করতে, ক্রমশ আমিও ভুলতে শুরু করেছি যে আমি তোমার নায়িকা শুধুমাত্র এক সন্ধের মঞ্চে—তাই বাইরের সব ফাঁকা। কিছুতেই তা হতে পারে না—আমি তো তোমার সঙ্গে অভিনয় করিনি ঠাকুরপো—সত্যিই তো অত মানুষের সামনে মঞ্চের ওপর সেদিন আমার হৃদয়ের বরমাল্য পরিয়ে দিয়েছিলাম তোমার গলায়—আমার সর্বনাশের পথে সেইদিনই পা ফেলেছিলাম নিশ্চিতভাবে।

মহড়ায় মেজবউঠাকরুণ আর আমার স্বামীকে ওইভাবে বসে থাকতে দেখে মাথায় দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। দেখলাম, মেজবউঠাকরুণ আমার দিকে বাজপাখির মতো তাকিয়ে আছেন। তখনও বুঝতে পারিনি, আমি তাঁর শিকার—সত্যি সত্যিই ঘনিয়ে আসছে আমার মৃত্যুর মুহূর্ত, এই নাটকের মহড়ায় রোপিত হয়েছিল আমার ধ্বংসের বীজ।

ঠাকুরপো, আমি মেজবউঠাকরুণকে যেন শুনিয়ে-শুনিয়ে সেদিন তোমার হাত ধরে, তোমার চোখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে উচ্চারণ করলাম আমার স্বামীর লেখা এই লাইনগুলি।

'আমি জগতের সমক্ষে, চন্দ্রসূর্যকে সাক্ষী করিয়ে, মুক্তকণ্ঠে বলিব, লক্ষবার বলিব, তুমিই আমার স্বামী, শতবার বলিব, সহস্রবার বলিব, লক্ষবার বলিব, আমি তোমার স্ত্রী।'

অন্যদিনও মহড়ার সময়ে কতবার বলেছি এই লাইনগুলি। কিন্তু সেদিন বলেছিলাম এমন আকুলতার সঙ্গে যে তুমিও তকিয়ে রইলে আমার দিকে—আমার কথা শেষ হওয়ার পরেও যাওয়ার দিনে বলে যাই, তোমার সেই নীরব আর্তিময় আঁখিপাতের মায়া ভুলতে পারিনি।

আমি তাকালাম মেজবউঠাকরুণের দিকে। চোখে তাঁর কী ঘৃণা! কী রাগ! কী ঈর্ষা! মনে হল, তুমি কি পারবে আমার হাত ধরে দাঁড়াতে এই ভয়ংকর প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে! সেই প্রথম ভয় দেখা দিল আমার মনে—মৃত্যু ভয়।

মেজবউঠাকরুণ উঠে গেলেন মহড়া থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যে চলে গেলেন তোমার নতুনদাদাও।

ক'দিনের মধ্যেই বাবামশায়ের কাছ থেকে আদেশ এল—আদেশ এল তোমার মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও—তোমাকে দ্বিতীয়বার বিলেত যেতে হবে—ব্যারিস্টার হওয়ার জন্যে! আমি বুঝলাম, মেজবউঠাকরুণের অব্যর্থ চাল—আমার দাঁড়াবার কোনও জায়গা থাকল না। বাবামশায়ের আদেশ তো চাপা হুঙ্কার। রবি, তোমারই বা শক্তি কোথায় টুঁ শব্দটি করার!

ইতিমধ্যে ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ দ্রুত বদলাতে লাগল। গানবাজনার সমাবেশ সরে গেল মেজবউঠাকরুণের বাড়িতে। তোমার নতুনদাদাকেও ধীরে ধীরে সরিয়ে নিলেন তিনি

আমার কাছ থেকে, তাঁর প্রশ্রয়ে ও আশ্রয়ে। থিয়েটারের জগতের দিকে পা বাড়ালেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। তাঁর ঘনিষ্ঠতা বাড়ল নটীদের সঙ্গে। ঠাকুরবাড়ির মেয়েমহলে ব্যবহার আরও নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। শুধু তোমার ভালোবাসার জোরে, তোমাকে কাছে পাওয়ার আনন্দে আমি বেঁচে রইলাম।

এই অবস্থায় তোমাকে দ্বিতীয়বার বিলেত পাঠাবার কথা উঠল। এই তো ফিরল দু-বছর পরে। কী কষ্ট পেয়েছি দু'-বছর তোমাকে একবারও না দেখে। আবার বিচ্ছেদ? একাকিত্ব? মনকেমনের কষ্ট? বুঝলাম, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। ওই যন্ত্রণা আরও একবার সহ্য করার শক্তি আমার মধ্যে নেই। তোমাকে বললাম সে-কথা। কত করে অনুরোধ করলাম, যেও না ঠাকুরপো। আমাকে ছেড়ে যেও না। বাঁচব না আমি তোমাকে ছেড়ে।

তবু তোমাকে নিয়ে তোমার জাহাজ ছাড়ল বিলেতের পথে।

আমার রাগ হল। আমার অভিমান হল। অপমানিত মনে হল। আমার মনে হল, তোমাকে ভালোবেসে কষ্ট পাওয়ার শক্তি আমার ফুরিয়ে গেছে।

আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে-চেষ্টা আমার ব্যর্থ হল। সবাইকার চাপা হাসি আর করুণার মধ্যে আমি ফিরে এলাম জীবনে। কারও বুঝতে বাকি রইল না তোমার

সঙ্গে ছাড়াছাড়ির কষ্ট সামলাতে না পেরে আমি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলাম।

আমার পক্ষে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে আর থাকা সম্ভব নয়। এ কথা বুঝেছিলেন আমার স্বামী। তিনিই আমাকে নিয়ে গেলেন চন্দননগরে মোরান সাহেবের বাগানবাড়িতে। তিনি আশা করেছিলেন হয়তো সেখানে গঙ্গার বাতাস আমার হৃদয় জুড়াবে। জুড়ালো হৃদয় জুড়ালো। গঙ্গার বাতাস লেগে নয়। যখন ফিরে এলে তুমি। বিলেত না গিয়ে, মাদ্রাজে জাহাজ থেকে নেমে সোজা চলে এলে চন্দননগরে। ঠাকুরপো, তোমাকে আবার বুকে জড়িয়ে ধরে মনে হল কিছুক্ষণের জন্যে জীবনের বর্ণ-গন্ধ ফিরে এল। একথাও তখন নিশ্চিতভাবে আমি বুঝেছিলাম তোমার এই ফিরে আসার ফল ভালো হবে না। বাবামশায়ের শাসন আমাকে চুরমার করবে। তোমার জীবনও সুখের হবে না। বাবামশায় বেশিরভাগ সময়েই থাকেন হিমালয়ের পাদদেশে, ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হয়ে। কিন্তু তাঁর নেপথ্য শাসনেই চলে ঠাকুরবাড়ি, তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস কারও নেই। সেকথা বোঝে বাড়ির ইট-কাঠ-পাথরও।

আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের ক'দিন কেটেছিল তোমার সঙ্গে, ঠাকুরপো তোমার নীরবচ্ছিন্ন সংসর্গে, চন্দননগরে। তোমার সঙ্গে এমন মনোবাসের কোনও সুযোগ পাইনি আমি

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে।

মনে পড়ছে, সকাল থেকে বৃষ্টি সেদিন। তুমি আমাকে শোনাবে বলে সুর বসালে বিদ্যাপতির 'ভরা বাদর মাহ্ ভাদর' পদটিতে। বৃষ্টিপাত মুখরিত জলধারাচ্ছন্ন সেই মধ্যাহ্নে আমরা দু'জনেই গানে-সুরে-প্রেমে হয়ে গেলাম খ্যাপার মতো। ঠাকুরপো, তোমাকে কত আদর করেছিলাম, মনে আছে তোমার? আমরা দু'জনেই গান গাইতে-গাইতে বাগানের গাছপালার সঙ্গে সারা দুপুর ভিজেছিলাম। বৃষ্টি যেমন বাগানটিকে আচ্ছন্ন করেছিল, ঠিক তেমনি কি আমিও আচ্ছন্ন করিনি তোমাকে? মনে পড়ে তোমার? না কি নতুন বউ পেয়ে সব ভুলেছ?

কোনও-কোনও দিন আমরা সূর্যাস্তের সময় নৌকা করে বেরিয়ে পড়তাম।

একদিন তুমি বললে, 'নতুনবউঠান, দ্যাখো দ্যাখো, পশ্চিম আকাশে সোনার খেলনার কারখানা একেবারে নিঃশেষে দেউলে হয়ে গিয়ে পূর্ববনান্ত থেকে চাঁদ উঠে আসছে।'

আমি বললাম, 'ঠাকুরপো, এই মুহূর্তে আমি ধরণীর সবথেকে ভাগ্যবতী নারী। তোমার মতো পুরুষের সঙ্গে এমন সোনালি সন্ধ্যায় আর কোন নারী কবে কোন যুগে এমন ভেসে গিয়েছিল বলো?'

তুমি বললে, 'ভাগ্যবান তো আমি নতুন বউঠান। একটু

পরেই আমরা বাগানের ঘাটে ফিরে নদীতীরের ছাদটার ওপর বিছানা করে বসব—তুমি আর আমি। তখন জলে-স্থলে বিরাজ করবে শুভ্র শান্তি। নদীতে নৌকা প্রায় থাকবেই না। অন্ধকারে তীরের বনরেখা হয়ে উঠবে নিবিড়।'

কথা শেষ করে ঠাকুরপো তুমি তাকিয়ে ছিলে আমার দিকে অনেকক্ষণ। আমার হঠাৎ মনে হয়েছিল, তোমার-আমার ইচ্ছে ছড়িয়ে আছে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যডোবার রঙে।

ঠাকুরপো, সেদিনের সূর্যাস্তের রঙের সঙ্গে আজকের সূর্যাস্তের কোনও মিল নেই। আজ আমার জীবনের শেষ সূর্যাস্তের পরে নামবে নিবিড় অন্ধকার—সে অন্ধকার মৃত্যুর। সেই অন্ধকারের মধ্যে শেষ হয়ে মিলিয়ে যাবে চন্দননগরের সব স্মৃতি—সেই দু'জনের কল্পনার রাজ্য, সেই মৃদু হৃদয়কথা কিংবা দু'জনে কোনও কথা না বলে শুধুই নীরবে বসে থাকা, সেই ভোরবেলার বাতাস, সেই সন্ধেবেলার গঙ্গা, নদীর ওপর সেই ঘনঘোর বর্ষার মেঘ, তোমার কণ্ঠে বিদ্যাপতির গান—সব মিলিয়ে যাবে মৃত্যুর নিবিড় অন্ধকারে।

রবি, যদি আমার মৃত্যুর অনেক বছর পরে তুমি কোনওদিন ফিরে আসো চন্দননগরের ওই বাড়িতে! যদি গিয়ে দেখো বেমেরামতি অবস্থায় সে-বাড়ি ভেঙে গিয়ে বনজঙ্গলে ঢেকেছে! সেদিনও হয়তো নতুন বর্ষা নেমেছে, সেদিনও হয়তো মেঘের ছায়া ভেসে চলেছে স্রোতের ওপর ঢেউ খেলিয়ে-খেলিয়ে—

তোমার কি মনে পড়বে আমার চোখ দু'টি তখনও, গুনগুনিয়ে উঠবে তোমার মনের মধ্যে এই গান—তোমার দু'খানি কালো আঁখি পরে বরষার কালো ছায়াখানি পড়ে? তোমার মনের মধ্যে সেদিনও কি জেগে উঠবে বিদ্যাপতির পদ, 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর?'

ঠাকুরপো, কী সব পাগলের মতন বকছি বলো তো? মনটা আমার একেবারে শিথিল হয়ে গেছে যে—আর যে লিখতে পারছি না ঠাকুরপো।

একটু আগেই আমি একটি একটি করে সবগুলো খেয়েছি। অনেকদিন ধরে জমিয়ে তোলা আফিমের গুলিগুলো। আর আমার পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব নয়। সত্যিই চললাম।

মনে পড়ছে মোরানসাহেবের বাগানবাড়িতে রঙিন শার্সিতে ওই ছবিটা—পুরুষ আর নারী, দু'জনে দুলছে নিভৃত নিকুঞ্জে। তুমি বলেছিলে, নতুনবউঠান, দ্যাখো, ঠিক তুমি আর আমি।

মনে পড়ছে চন্দননগরের বাড়ির ছাদে সেই নির্জন গোল ঘরটা। সেই ঘর আমি নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছিলাম তোমার জন্যে। তুমি বলেছিলে, 'এই আমার কবিতার ঘর। লিখব আমি, শুনবে তুমি।'

তারপর কেমন ঘোর লেগে গেল তোমার। আমার খুব কাছে এসে দাঁড়ালে।

আমি ধীরে তোমার বুকের মধ্যে মুখটি গুঁজে ভুলে গেলাম

আর সব কিছু।

তুমি কি নিবিড় কণ্ঠে বললে ঃ

'অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর
তোর তরে কবিতা আমার।'

ঠাকুরপো, সেদিন কি তোমার সত্যিই মনে হয়েছিল আমিই তোমার কবিতা? তোমার বুকের মধ্যে যে কবিতার ঘরটি আছে, সেটি আমারই ঘর—আর কারও নয়! ঠাকুরপো, কোনওদিন সেই ঘরটি আর কোনও মেয়েকে আমি ছেড়ে দিতে পারব না, কিছুতেই না।

চন্দননগর থেকে কলকাতায় ফিরলাম আমরা। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আমাদের দু'জনের জন্যেই যেন বদলে গেছে এই ক'দিনে। শুধু চাপা গুঞ্জন, বাঁকা দৃষ্টি। বিশেষ করে আমার পক্ষে জোড়াসাঁকোর বাড়ি দুর্বিষহ হয়ে উঠল। এই মধ্যে তুমি 'ভারতী' পত্রিকায় লিখলে সেই মারাত্মক লেখা—

'সেই জানালার ধারটি মনে পড়ে, সেই বাগানের গাছগুলি মনে পড়ে সেই অশ্রুজলে সিক্ত আমার প্রাণের ভাবগুলিকে মনে পড়ে।

আর একজন যে আমার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে মনে পড়ে। সে যে আমার খাতায় আমার কবিতার পার্শ্বে হিজিবিজি কাটিয়া দিয়েছিল, সেইটে দেখিয়া আমার চোখে জল আসে। সেই তো যথার্থ কবিতা লিখিয়াছিল।'

এ লেখা প্রকাশিত হওয়ার পরেই আমি প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আমার বাঁচার আর পথ নেই—তুমিই সে-পথ বন্ধ করে দিলে।

এর পরেই বাবামশায় তলব করলেন তোমাকে মুসৌরিতে। বললেন, তোমাকে অবিলম্বে বিয়ে করতে হবে। তুমি মাথা পেতে মেনে নিলে সেই অমোঘ আদেশ। ঠাকুরপো, টুঁশব্দটি করার সাহস হয়নি তোমার। না কি, তুমিও মনে মনে চেয়েছিলে বিয়েটা সেরে ফেলতে। যাইহোক, শুরু হল তোমার জন্যে মেয়ে দেখার পর্ব। আর কোথায়? সেই যশোরে!

ঠাকুরপো, কঠিনতম আদেশটি তোলা ছিল আমার জন্যে। তোমার কনের দেখার দায়িত্ব পড়ল আমার ওপর! আর সঙ্গে থাকবে তুমি! বাবামশাই স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মৃত্যুদন্ড

কী অনায়াসে আমাকে দিয়েছিলেন! আমার মৃত্যু ঘটেছিল যশোরেই।

দক্ষিণডিহি, চেঙ্গুটিয়া কত জায়গা থেকে যে কত মেয়ের খবর আসত। দৌড়ে যেতাম। সঙ্গে কখনও-কখনও তুমিও থাকতে। তোমার অমন ভাবলেশহীন মুখ আমি কখনও দেখিনি ঠাকুরপো। তোমার ভাবটা ছিল এমন, যে মেয়েকে আমি পছন্দ করব, তুমি বিয়ে করতে প্রস্তুত তাকেই। তোমার মুখে পছন্দ-অপছন্দের কোনও আভাস পেতাম না আমি। অনেক মেয়ে দেখা হল। আমার তো কাউকেই পছন্দ হল না। ভাবলাম, গেল বুঝি বেশ কিছুদের জন্য তোমার বিয়েটা পিছিয়ে। হঠাৎ বুকের উপর থেকে যেন একটা ভারী পাথর গেল নেমে। ভেতরে-ভেতরে কী যে পুলক জাগল ঠাকুরপো, তোমাকে বোঝাতে পারব না। তোমাকে বলেছিলাম, ঠাকুরপো, এবছর যশোরে সুন্দরী মেয়ের আকাল পড়েছে। কী আর করবে বল? মন খারাপ কোরো না। বিয়েটা তোমার এ-বছর হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে। আমার সেই খুশি-খুশি কথাগুলো কি মনে আছে তোমার?

বিনা মেঘে আকস্মিক বজ্রাঘাৎ ঘটালেন মেজবউঠাকরুণ। তিনি বললেন, রবির বিয়ে এ-বছর হবেই। কাউকে না পেলে আমাদের কাছারির কর্মচারী বেনী রায়ের মেয়ে ভবতারিনীর সঙ্গেই রবির বিয়ে দিয়ে দেব। যশোরের ফুলতুলি গ্রামের

মেয়ে ভবতারিনী। মেজবউঠাকরুণ বললেন, হাতের কাছে যশোরের মেয়ে থাকতে কেন খুঁজে মরছি চারধারে। ঠাকুরবাড়ির বউয়েরা অধিকাংশই তো যশোরের মেয়ে—ও মেয়ে ভালো মেয়ে হবেই। কথাটা বলেই মেজবউঠাকরুণ তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। তাঁর সেই চাউনি জীবনের এই শেষ দিনেও ভুলতে পারিনি ঠাকুরপো।

বুকের ওপর আবার সেই ভারী পাথরটা ফিরে এল। নিশ্বাস যেন আটকে গেল। এক ফুঁয়ে আমার সেই খুশিভাব নিবে গেল। মনে হল আর কোনও পালাবার পথ নেই আমার। সেই মুহূর্তে অমোঘ নিয়তি ঠেলে দিল আমাকে মৃত্যুর দিকে। পঁচিশ বছর বয়েসে মরতে ইচ্ছে করছে না ঠাকুরপো। কিন্তু বাঁচব কেন? কীসের জন্যে? কাকে ভালোবেসে?

বেনী রায়ের ন'বছরের মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের ঠিক হতেই আমি দীর্ঘ দিনের জন্যে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। ভগবৎ ডাক্তারের হাতে পড়ল আমার চিকিৎসার ভার। ডাক্তার ভাবল গোলমাল বুঝি সবটাই আমার শরীরের। কেন আমার শ্বাসকষ্ট। কেন আমার ক্রমশ রোগা আর দুর্বল হয়ে যাওয়া। কেন আমার খেতে ইচ্ছে করে না, কেন সব সময় বিষণ্ণতায় ভুগছি আমি। এই অসুস্থতার আসল কারণটা কোনও দিন ঠাওর করতে পারেননি ভগবৎ ডাক্তার। খালি ওষুধের পর

ওষুধ লিখেছেন। কেউ জানতেও পারেনি, আমি সে সব ওষুধ নর্দমায় ঢেলে দিয়েছি।

আবার চোখের সামনে চলতে লাগল তোমার বিয়ের আয়োজন। ঠাকুরবাড়ির আর সব মেয়ে বউয়ের সঙ্গে আমাকেও মিলতে হল তোমার বিয়ের আয়োজনে। তোমার বউয়ের শাড়ি-গয়না পছন্দের সময়েও আমাকে ডাকলেন মেজবউঠাকরুণ। আমি মরতে-মরতে সব দায়িত্ব পালন করতে লাগলাম।

এরপর একদিন বিকেলবেলা তুমি এলে আমার ঘরে। যেমন এক সময়ে আসতে রোজ। আমাকে পড়ে শোনাতে তোমার নতুন কবিতা, গেয়ে শোনাতে তোমার নতুন গান। সেদিন বিকেলে একখানি চিঠি দিলে আমার হাতে। খুলে দেখি এক অভিনব নেমনতন্নের চিঠি—তুমি নিজেই লিখেছ—

'আগামী রবিবার ২৪শে অগ্রহায়ণ তারিখে শুভদিনে শুভলগ্নে আমার পরমাত্মীয় শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শুভবিবাহ হইবেক। আপনি তদুপলক্ষে বৈকালে উক্ত দিবসে ৬ নং জোড়াসাঁকোস্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে উপবস্থিত থাকিয়া বিবাহাদি সন্দর্শন করিয়ো আমাকে ও আত্মীয়বর্গকে বাধিত করিবেন।

ইতি, অনুগত শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।'

চিঠিটা প্রথমবার পড়ার পর আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

আমি খাটের ওপর বসে পড়লাম। তারপর চোখে জল এল। দ্বিতীয়বার পড়ার পর কিছুতেই কান্না সামলাতে পারিনি। সেই কান্না গভীর দুঃখের, তবু সেই কান্নাতে কোথায় যেন একটু ক্লান্ত আনন্দও মিশে গেল। বললাম, ঠাকুরপো, নিজের বিয়ে নিয়ে এমন নিদারুণ নিষ্ঠুর ঠাট্টা কেউ করতে পারে!

তুমি খাটের কাছে এগিয়ে এলে, আমাকে টেনে নিলে তোমার বুকের মধ্যে। আমার নিঃশব্দ কান্নায় ভিজে গেল তোমার বুক। তারপর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেলে আমার ঘর থেকে। এরপর আর কোনওদিনই আমার ঘরে এলে না। তোমার বিয়ে হয়ে গেল ১৮৮৩-র ৯ ডিসেম্বর—আজ থেকে চার মাস আগে। আমার প্রাণের ঠাকুরপো, তোমার নতুনবউঠানের দিন ফুরালো। তার জীবনের শেষ দিন। আর তো সময় নেই আমার। মাথা ঘুরছে। চোখ বুজে আসছে। দৃষ্টি ক্রমেই ঝাপসা। আর বুকের ভেতরটা ঘামে ভিজে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল যে।

আমি দরজা বন্ধ করে দিয়েছি। আমি টেবিলের ওপর সাজিয়ে রেখেছি আমার সেলাইয়ের বাক্সটি।

আমি জানালার পাশে ফুলগাছের টবটিতে শেষবারের মতো জল দিয়েছি।

আমি আমার নাম-লেখা হাতপাখাখানি—ওটা রেখে গেলাম বালিশের ওপর।

গল্পের বইখানা, যেটি পড়ছিলাম ক'দিন ধরে, শেষ করতে পারলাম না, মাঝের পাতায় একটি চুলের কাঁটা গুঁজে রাখলাম—ওখানেই থামতে হল যে।

আর তোমার-আমার চিঠিগুলো সব ছড়ানো থাকল টেবিলের ওপর—আর তো লুকোবার কিছু নেই।

ঠাকুরপো, ওদের জ্বলতে দিও আমার সঙ্গে চিতায়।

কোনও প্রমাণ রেখো না ঠাকুরপো—কোনও প্রমাণ রেখো না আমাদের সম্পর্কের।

ঠাকুরপো, আর প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তবু লিখে গেলাম—আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

দায়ী নন বাবামশায়, স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, যিনি জোর করে তোমার বিয়ে দিয়ে আমার কাছ থেকে তোমাকে কেড়ে নিলেন।

দায়ী নন আমার মেজজা জ্ঞানদানন্দিনী যিনি কোনওদিনই আমাকে তোমার নতুনদাদার যোগ্য স্ত্রী ভাবতে পারলেন না। দিলেন না এতটুকু সম্মান।

দায়ী নন তোমার নতুনদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যাঁর জোব্বার পকেটে আমি পেলাম এক বিখ্যাত নটীর প্রেমপত্র। সেই প্রেমপত্রের নীচে কোনও নাম ছিল না।

ঠাকুরপো, তুমিও নও দায়ী—তোমার জীবনে শুরু হল নতুন খেলা, জায়গা তো ছেড়ে দিতেই হবে পুরাতনকে। তুমিই তো লিখেছ ঠাকুরপো,

'ঢাকো তবে ঢাকো মুখ, নিয়ে যাও দুঃখ সুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে,—
হেথায় আলয় নাহি, অনন্তের পানি চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে।'

তাই হোক ঠাকুরপো, আঁধারেই মিলিয়া যাব আমি। কিন্তু তুমি দায়ী নও কোনওভাবেই।

ঠাকুরপো, আমার মৃত্যুর জন্যে দায়ী আমার অমোঘ নির্বোধ নিয়তি। পাপ যাকে বিদ্ধ করে না। পুণ্য যাকে বদলাতে পারে না।

'আমাকে মনে রেখো রবি', এ-কথাটুকু বলার স্পর্ধাও আমার নেই। আমার সব গেছে গো সব গেছে।

রবি—শুধু ভালোবাসাটুকু যায়নি। আজও তোমাকে খুব ভালোবাসি। এইটুকু বিশ্বাস কোরো।

তোমার নতুনবউঠান

জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৪১।
কর্মজীবন শুরু হয় স্কটিশ চার্চ কলেজে
ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনায়।
কিন্তু সৃজনের দুর্নিবার স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা অহর্নিশ
যাঁকে উদ্বেল করেছে, তাঁর কাছে ক্রমেই
অসহনীয় হয়ে উঠল অ্যাকাডেমিক
পরিবহের শৈত্য ও শৃঙ্খল। দীর্ঘ ১৬ বছরের
অধ্যাপনা ছেড়ে তাই আশির দশকে যোগ
দিলেন সংবাদপত্রে। প্রথমে 'আজকাল'
পত্রিকার সহ-সম্পাদক, তারপর
আনন্দবাজার পত্রিকার সহ-সম্পাদকের
দায়িত্বে। বর্তমানে 'সংবাদ-প্রতিদিন'-এর
সহ-সম্পাদক।
ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে বেশ কিছু বই।
সাহিত্য ও সাংবাদিকতার জন্য নানা-জগতে
অনায়াস পরিভ্রমণ তাঁকে প্রাণিত করেছে
বিচিত্রবিষয়ক লেখা লিখতে। ফিচার প্রবন্ধ
উপন্যাস। সেইসব আশ্চর্য রচনা একাধারে
যেমন তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে অন্য-উচ্চতায়,
তেমনই সৃষ্টি করেছে নতুন বিতর্ক।
ভালোবাসেন পড়তে, আড্ডা দিতে,
বেড়াতে। এবং অবশ্যই লিখতে।

প্রচ্ছদ সুদীপ্ত দত্ত

ঠিক সুইসাইড নোট নয়, এক সুদীর্ঘ চিঠি !....
না, চিঠিও নয় ।....এক হতভাগ্য তরুণীর
বেদনাবিধুর উপাখ্যান, যিনি রবীন্দ্রনাথের
প্রাণের সখা নতুন বউঠান কাদম্বরীদেবী ।

INR 100.00
9 788183 741491
www.bookspatrabharati.com